শিবরাম চক্রবর্তী

জ্যোতি প্রকাশন
২এ, নবীনকুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

২এ, নবীনকুণ্ডু লেন

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৩৪৯

মুদ্রাকর :

শ্রীভারতী প্রেস

১১৪/১এ, আমহার্স্ট স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

উৎসগ

শ্রীজয়দেব রায়

শ্রীমতী ফুল্লরা রায়

শ্রীমান সোমদেব রায়

—কল্যাণীয়েষু

: লেখকের অন্যান্য বই :

বাড়ি থেকে পালিয়ে

বন্ধুর দর্শন লাভ

ট্রেন একটা স্টেশনে দাঁড়িয়েছে। আমার কামরায় আমি একলা। মুখ বার করে বাইরের শোভা নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করছিলাম—কিন্তু কী আর দেখব? সমস্ত চীনেম্যানের মত সব স্টেশনের একই সৌন্দর্য। সেই একই রেলিং, এক ঢঙের বাড়ি, একজাতীয় স্টেশন মাষ্টার, এক ধরণের যাত্রীরা, এমন কি, লক্ষ্য করে দেখছি, প্রত্যেক স্টেশনে গার্ড সাহেবও এক। 'গরম চা'—'পান বিড়ি সিগারেট'—এমন কি, ঘণ্টাধ্বনি পর্যন্ত একরকম।

দৃশ্য কিংবা শ্রাব্যের কিছু নূতনত্ব ছিল না। নূতনত্বের মধ্যে আমার কামরায় একটি নতুন আমদানী দেখা গেল। গাড়ী ছাড়বার আগে, সুটকেশ হাতে হন্তদন্ত হয়ে এক ভদ্রলোক প্রবেশ লাভ করলেন।

ভদ্রলোকের গায়ে দামী কোট—অবস্থাপন্ন বলে সন্দেহ হয়। সুটকেসটা বাদামী, কিন্তু তাহলেও ভারগর্ভতা থেকে তার সারগর্ভতা আন্দাজ করা অমূলক হবে না।

সুটকেসটা বাঙ্কে রাখার পর আমি তাঁর চক্ষে পড়লাম?

"এই যে! অনে—ক-দিন পরে!" তিনি বলেন। দর্শন মাত্রই আমাকে যে তিনি চিনতে পেরেছেন তার চিহ্ন তাঁর মুখে সকাল-বেলায় সূর্যকিরণের মত ছড়িয়ে পড়ল।

"এই যে! অনে—ক দিন পরে!" আমিও পুনরুক্তি করেছি। যদিও অনেকদিন পরে যে, এবিষয়ে দ্বিরুক্তি করার কিছুই ছিল না। সতর্ক হয়ে বসতে হয়। একেই আমার চোখ খারাপ, উপাদেয়

দ্রষ্টব্য ছাড়া আর কিছু এই পোড়া চোখে পড়তেই চায় না, তার ওপরে রাস্তায় ঘাটে অচিন্ত্যনীয় দেখা-সাক্ষাৎ লেগেই আছে।.. চোখের দোষ নয়, লোকেরও কোনো দোষ দিই না—ও আমার কপালের দোষ।

তবু একটু সতর্ক থাকা দরকার, কি জানি যদি আলাপের ত্রুটিতে বিলাপের কোনো কারণ ঘটে যায়? তবে আমি চালাক ছেলে! এরকম ক্ষেত্রে অপর পক্ষ 'আপনি' বলে সম্বোধন করলে আমিও 'আজ্ঞে' বলতে কসুর করি না, সে 'তুমি' বলে শুরু করলে আমিও তখন, 'তুমি' চালাই, আর যদি 'তুই তোকারি' আরম্ভ করে দেয় —তখন আমাকেও বাধ্য হয়ে—কি করব?—আমিও ছেড়ে কথা বলবার পাত্র নই তো!

নিশ্চয় আগে চিনতাম—হয়তো খুব প্রাগাঢ় ঘনিষ্ঠতাই ছিল এককালে—কিন্তু এখন আর চেনা যাচ্ছে না—এমন লোকের সঙ্গে নতুন আলাপ জমানো যে কী মুশকিল। অনেক সময়ে আবার এমন দুর্ঘটনাও ঘটে,—সর্বদাই যে আপনি-তুমির সমস্যা আপনা-আপনি ফয়সলা হবার সুযোগ পায় তা হয় না—অনেক সময়ে এমন হোলো যে আক্রমণকারী কোনো মতে ধরাছোঁয়াই দিল না—কোনো প্রকার সম্বোধনের ধার দিয়েই ঘেঁষল না একদম। তখন অগত্যা ভাববাচ্যেই সারতে হয় আগাগোড়া: যথা, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?' 'কোথায় থাকা হয় আজকাল?, 'বাড়ীর সবাই বেশ ভাল তো?' ......ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি নড়ে চড়ে বসি, সম্বোধনের গতি দেখে আলাপের বিধি করতে হবে—এবং যদি সম্ভব হয়, আলাপ-সালাপের ভেতর দিয়ে তেমন যদি কোনো সূত্রপাত দেখি, লোকটাকে হয়ত পুনরাবিষ্কারও করতে পারি।

আপাদমস্তক উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম—আমার নব-আলাপিতের

নৈঋৎ কোণ থেকে অজ্ঞাতপূর্ব পরিচয়ের নতুন কোনো ঝড় আসে কিনা তার জন্য চোখকান খাড়া করে।

নিদারুণ ভাবে কোলাকুলি করে ভদ্রলোক আমার সামনে বসলেন।—"আশ্চর্য! এভাবে যে দেখা হবে কে ভাবতে পেরেছিল?" বল্লেন তিনি।

সত্যি! কে একথা ভেবেছিল, আমি ভাবলাম। আমিও ভাবতে পারিনি! "আশ্চর্যই তো!" আমিও বলতে বাধ্য হলাম।

"একটুও বদলাও নি তুমি।" সে বল্ল।

"তুমিও ত প্রায় সেই রকমের আছো।" আমি বল্লাম, বেশ অন্তরের সঙ্গে সায় দিয়েই বল্লাম। সত্যি বলতে, সম্বোধনের বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হবার সাথে সাথে তার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অন্তরঙ্গতাও বোধ করছিলাম যেন। ঘাড় থেকে, বলতে কি, যেন একটা ভার নেমে গেছল। যদিও নতুন একটা গন্ধমাদন এসে চাপলো, তাহলেও, তুমিত্বের মধ্যে ওকে লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার আমিত্বও যেন আমি ফিরে পেলাম—

"তবে তুমি যেন একটু মোটা হয়েছ আগের চেয়ে—" সমালোচকের দৃষ্টিতে ও আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছাখে।

"হ্যাঁ, একটু।...কিন্তু তোমাকেও তো বড় রোগা দেখছিনে হে!" ওর অভিযোগ মেনে নিলেও, ওর স্থূলত্বের মধ্যেই আমার অপরাধের অনেকখানি সাফাই যেন রয়ে গেছে বলে আমার মনে হয়!

"মোটা হওয়া কিছু দোষের নয়,—আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের আয়তনও বাড়ে। কিন্তু ছেলেবেলায় তুমি কী রোগাই না ছিলে, ইস্! হাওয়ায় যেন উড়তে! অবিশ্যি, লঘুত্বে আমিও তখন কিছু কম যেতাম না।...যাক্ গে..." অতীতের আর বর্তমানের—আমাদের ব্যক্তিগত অপরাধ ও মার্জনার চোখে দেখতে চায়।

আমিও আর শরীরের দিকে নজর দিই না। "যেতে দাও।" বলে দুজনের সমবেত ওজনকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিই।

এই সব বাক্যালাপের ফাঁকে-ফোকরে লোকটাকে আন্দাজ করার চেষ্টা পাই, কিন্তু মুশকিল এই, মানুষের মুখই যে শুধু আমি ভুলে যাই তাই না, তাদের নামও আমার স্মরণে আসে না—এমন কি, কোথায় যে কোন মূর্তিমানকে কোন অশুভক্ষণে প্রথম দেখেছিলাম তাও কিছুতে মনে পড়তে চায় না। তাছাড়া পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে কারো যে খই পাবো তারই বা যো কী। কে আর কার সাজসজ্জা কোন্ কালে খুঁটিয়ে দেখেছে? কিন্তু এইসব খুঁটি-নাটি বাদ দিলে প্রত্যেককে আমি বেশ ভালো রকমই চিনতে পারি। এবং এজন্য আমার যথেষ্ট গর্ব আছে।

যাক্। নাম আর চেহারা মনে না এলেও কিছু আসে যায় না—কেবল একটু হুঁসিয়ার থাকলেই হয়। কথাবার্তার খেই ধরে থাকতে পারলেই খেয়া পার হওয়া যায়। এক্ষেত্রেও আমাকে একটু তৎপর হয়ে থাকতে হবে। এবং তা পারলেই, এই আলাপ-পারাবার শেষ পর্যন্ত ঠিক উৎরে যাব সন্দেহ নেই।

"উঃ, কদ্দিন পরে এই দেখা!" ওর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

"বহুৎদিন।" ক্ষুণ্ণকণ্ঠে আমি জবাব দিলাম। তার বিরহে আমিও যে নিতান্ত সুখে ছিলাম না, বিষণ্ণতার আমেজ এনে ওকে সমঝাতে চাইলাম।

"কিন্তু দিনগুলো দেখতে দেখতে কেটে গেছে।"

"ঠিক বিদ্যুতের মতো।" আমি সায় দিই।

"আশ্চর্য!" ও বলতে আরম্ভ করল—"জীবনের কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। বছরের পর বছর কি করে যে দেখতে না দেখতে কেটে যাচ্ছে—" সে দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে।

"ভালো করে দেখতে না দেখতেই।" অমি ওর দীর্ঘনিশ্বাসে যোগ দিই: "বাস্তবিক ভাবলে তাক লাগে।"

"কেটে যাচ্ছে আর পুরানো বন্ধুদের কোথায় যে আমরা হারাচ্ছি। কোথায় যে ওরা গেল, অনেক সময়ে আমি ভাবি।"

"আমিও।" আমি বলি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ভেবে কোনো কূলকিনারা পাই না। বস্তা বস্তা লোক সব গেল কোথায়? কোন্ অবস্থার মধ্যে গেল? মারা গেল, না খোয়া গেল? না, নিরুদ্দেশেই বেরিয়ে গেল বিজ্ঞাপন না দিয়ে? নাকি, সবাই পণ্ডিচেরিই চলে গেল বিনা নোটিশে?

"তুমি কি সেই পুরানো আড্ডায় যাও আর?" সে জিজ্ঞেস করে।

"কক্ষনো না।" আমি সুদৃঢ়তার সহিত বলি। স্পষ্টই একথা জানিয়ে দি। এবিষয়ে কোনো সংশয় রাখা ঠিক না—যতক্ষণ না, কোথাকার সেই পুরানো আড্ডা, তার ঠিকানা পাচ্ছি, তাকে যথাস্থানে স্থাপন করতে পারছি ততক্ষণ কোনো আলাপ-আলোচনার মধ্যেই তার উত্থাপন হতে দেয়া উচিত নয়।

"তাই।" সে বলে চলে: আমিও জানতাম যে তুমি আর সেখানে যেতে চাইবে না।"

"আজকাল আর যাইনে।" গদগদ স্বরে আমি জানাই।

"বুঝতে পারছি। বিশেষত; সেই বিচ্ছিরি কাণ্ডটা ঘটবার পর কি করেই যাবে। যাক্, ঐ প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপনের জন্যে আমি দুঃখিত। তুমি আমায় মাপ করো।" অনুতপ্ত কণ্ঠে ও আমার মার্জনা ভিক্ষা করে।

আড্ডাঘটিত দুর্ঘটনার পরিমাপ করতে না পারলেও ওকে আমি মাপ করে দিই। পুরানো স্মৃতির পূর্বক্ষতমূলে পুনরাঘাত লাভ করে মুখ চুন করে থাকি। আশানুরূপ আমাকে মর্মাহত হতে হয়—কি করব?

ক্ষণিক স্তব্ধতার পর আবার ও শুরু করে: "মাঝে মাঝে পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়। তারা তোমার কথা জিগেস করে। তুমি কী করছ জানতে চায়।"

"হতভাগারা!" আমি মনে মনে বলি—মুখ ফুটে বলতে সাহস পাই না।

"তাদের ধারণা তুমি একেবারে গোল্লায় গেছ?"

এবার আমার রাগ হয়। বারম্বার আহত হয়ে আমিও মরিয়া হয়ে উঠি। পাল্টা আক্রমণ চালাতে প্রস্তুত হই। অন্যান্য ক্ষেত্রে, আগের আগের বারে যে সব ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছি তারই একটা নিক্ষেপ করি এবার।

"ভালো কথা। আমি উদ্দীপ্ত হয়ে বলি: "আমাদের কেলোর কি খবর?"

এ অস্ত্র যে অব্যর্থ, আমার জানা। প্রত্যেক দলেই একটি কেলো থাকে? থাকবেই। কেলো, কালু, কালো, কেলে—নামকরণের প্রকারভেদে—ঘোরতর কৃষ্ণকায়—উক্ত বিশেষ্য পদবাচ্য কেউ না কেউ—না থেকেই যায় না।

"ওঃ! কেলো! সে এখন মলঙ্গা লেনের কোন্ এক আপিসে চাকরি করে। ইয়া মোটা হয়েছে—পাক্কা আড়াই মণ—তার ওপরে আবার রঙের যা খোল্তাই—যদি দেখতে! তাকে আর চেনাই যায় না! তুমি অন্ততঃ চিনতে পারবে না।"

নিশ্চয়ই না, সেকথা আমি হলপ করে বলতে পারি। এখনই এবং এখানেই—না দেখেই! অতঃপর আবার একটা শরসন্ধান করলাম—"হ্যাঁ, আমাদের পদা! পদা কী করছে?"

"পদা? কোন পদা? তুমি বুলুর ভাই পদার কথা বল্ছ?"

"হাঁ, বুলুর ভাইই তো! বুলুর ভাই পদার কথাই বলছি? প্রায়ই তার কথা আমার মনে পড়ে।"

কোনোরকমে সামলে নিই! প্রত্যেক বনেদী বন্ধুগোষ্ঠিতেই পদা বলে কেউ থাকে—পদস্থ ব্যক্তি কেউ না কেউ থাকবেই। আমাদের পুরোনো দলটাতেও তার ব্যতিক্রম থাকা উচিত হোতো না। পদাকে না ধরতে পারলে আমি নিজেই ধরা পড়ে বিপদে পড়তাম যে!

পদার কোন খবর নেই। তবে তার দাদা, মানে বুলু, সিভিক গার্ড হয়েছে। এ-আর-পি হবার চেষ্টা করেছিল খুব, কিন্তু হতে পারল না।

দুঃখের বিষয়। আমি সহানুভূতি প্রকাশ করি। খুবই দুঃখের বিষয়। তবে যা দিনকাল পড়েছে—রাস্তার একটা ফিরিওলাও সহজে হওয়া যায় না।

বিশেষ সংবাদ শুনেছ বোধহয়? তার সেই একমাত্র—তাঁকে চিনতে তো? বড্ড শোক পেয়েছে বেচারা। যদিও খুব বৃদ্ধ বয়সেই গিয়েছেন, দুঃখের কিছু নেই, তবুও সে ভারী কাতর হয়ে পড়েছে।

বিশেষ শোকে আমিও বিশেষ ব্যথা পাই, অকাতরে থাকতে পারি না। মৃত্যুমাত্রই শোকাবহ, বিশেই কি আর বিয়াল্লিশেই কি আর বাহাত্তরে হলেই বা কম কিসে। কিন্তু লোকটা কে? মানে, বিশের সম্পর্কে কে? বাবা নয় নিশ্চয়—বাবা তো একমাত্রই হয়—মায়ের মাত্রাও ঠিক তাই।—তাহলে? ছোট ভাইরা কিছু বিশের চেয়ে বেশি বুড়িয়ে মরতে পারে না। এ তবে কে রে বাবা?

যিনিই হোন্, আন্দাজের ঢিল ছুঁড়ি। হ্যাঁ, চিনতাম বই কি। দস্তুরমতই ভাব ছিল আমার সঙ্গে। বুড়ো বয়স পর্যন্ত তো বেশ টন্‌কো ছিলেন—দেখেছি বই কি। আহা—তাঁর সেই দিব্যকান্তি এখনো আমাদের চোখে ভাস্‌ছে। আর ওঁর সেই হুঁকো টানা। আহা, তামাক খেতে কী ভালোই না বাসতেন।

হুঁকো? বিশের পিসিমা হুঁকো টান্‌তেন? বলছ কি তুমি? নিজের কানকে ও যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

বিশের কোন পিসী? আমি ওর কোনো পিসীকে চিনিনে তো। আমি ওর পিসের কথাই বলছি।

ওর পিসেকে কেউ কখনো চোখে দেখেনি। বিয়ের রাত্রেই তো তিনি পালিয়ে যান।

কোন্ বেশে বল তো? ডুববার মুখে আমি শেষ তৃণটি পাকড়াই—আমার কেমন গোলমাল হচ্ছে।

ও, বুঝেছি। তুমি আমাদের বিশুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছো। হ্যাঁ, তাদের বাড়ীতে একজন হুঁকোখোর আছে বটে! তিনি ওর পিসে বুঝি? তাতো জানতুম না—তাহলে ঠিকই হয়েছে। না, তিনি মারা যান্‌নি—এখনো সমানে হুঁকো টেনে চলেছেন।"

"আঃ, শুনে বড় সুখী হলাম।" আমি বলি। বিশে এবং বিশুর মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে জেনে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

"এর পরের ইষ্টিশনই রাণাঘাট—তাই না?" আমার বন্ধু হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে ওঠেন—"রাণাঘাট অব্দি টিকিট কেটেছি—কিন্তু এখন ভাবছি কলকাতাই চলে যাই। এখানে গাড়ী থামলেই চট্ করে নেমে টিকিটটা আনা যাবে—কি বলো?"

আমি ঘাড় নাড়তেই তৎক্ষণাৎ উঠে তিনি পকেট হাতড়াতে আরম্ভ করলেন—তাঁর নিজের পকেট। "যাঃ, সুটকেসের চাবিটা আবার কোথায় ফেল্লুম? কী সর্বনাশ, ওর মধ্যেই আমার সব টাকাকড়ি যে! দেখি, তোমার চাবিটা দেখি, আমার কলে লাগে কি না দেখা যাক্!"

আমার সুটকেসের চাবিটা ওকে দিলাম—কিন্তু সে লাগ্‌তে রাজি হয় না—কোনোমতেই না। ইতিমধ্যে রাণাঘাট কিন্তু এসে হাজির হয়।

"খুচরো টাকা কয়েকটা দাওতো ভায়া, টিকিটটা কিনে আনি।" ও বলে: "শিয়ালদায় নেমে, ভেঙে হোক্ যা করে হোক্ এটা তো খুলতেই হবে। তখন তোমায় দিয়ে দেব—কেমন?"

বন্ধু হয়ে বন্ধুর একটু উপকার না করা ভাল দেখায় না—কটা টাকাই বা আর? আমি মাণিব্যাগটার মুখ খুলি—একটু ফাঁক করি মাত্র—কিন্তু ওঁর আর তর সয়না, উত্তেজনার মুখে গোটা মাণিব্যাগটাই হস্তগত করে তিনি নেমে পড়েন।

যাক্। এক্ষুণি তো ফিরে আস্‌ছে ফের। নাকের বদলে নরুণ —আমার ছোট মণিব্যাগের বদ্‌লি ওর ওই বৃহৎ সুটকেসটাই যখন জমা রেখে গেছে তখন আর ভাবনা কি? নরুণের বদলে মৈনাকই বরং বলতে হয়।

আমি মুখ বাড়িয়ে দেখি, ও টিকিটঘরের দিকে চলেছে, কিন্তু যেরকম ঢিমেতেতালায় চলেছে, আমার ভয় হয়, ট্রেন না ফেল করে বসে। তবু এখানে গাড়ী একটু বেশীক্ষণ দাঁড়ায়, এই যা।

গাড়ী প্রায় ছাড় ছাড়, কিন্তু বন্ধুর আমার দেখা নেই। একি, ওর মালপত্তর আমার হেফাজতে ফেলে—ও আবার গেল কোথায়? এমন সময় আরেক ব্যক্তি দরজা খুলে ঢুকলেন।

"এই যে। এই যে।" সেই ব্যক্তি বল্লেন। তাঁরও বদনমণ্ডলে পূর্ব পরিচয়ের চুশ্চিহ্ন—সেই অপূর্ব হাসি। অবিকল আগেকার অভিব্যক্তি।

আমি তটস্থ হয়ে পড়ি। কিন্তু না, এ হাসি আমাকে দেখে নয় —আমার বন্ধুর সুটকেসটি দর্শন করেই। ওটিকে হাতেনাতে পাকড়ে উনি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন:

"এই যে। এখানে ফেলে রেখে গেছে হতভাগা। বন্ধুদের কাউকে যদি বিন্দুমাত্র জানা যায়। বুঝব কি, চিনতেই পারা যায় না। দুঃখের কথা আর কি শুনবেন—আমি আপ্‌ ট্রেনে যাবো মশাই, কিন্তু এই ডাউন ট্রেনে আমায় যেতে হচ্ছে। শিলিগুড়ির বদলে কলকাতায় যাবার আমার একটুও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এমনি গ্রহের ফের, পোড়া দা ইষ্টিশনে দার্জিলিং মেলের জন্য অপেক্ষা করছি এমন সময়ে এক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে মুলাকাৎ! ছেলেবেলার কোন বন্ধু নিশ্চয়, চেনাই যায় না একদম। সে আমায় কিন্তু বেশ চিনেছে, তবে আমি যে তাকে চিনতে পারিনি মোটেই তা আমি তাকে বুঝতে দিই নি। গাড়ী ছাড়বার মুখে বন্ধুটি ভুল করে তার নিজের মনে করে আমার ব্যাগটি নিয়ে উঠে পড়লেন! কি করি

আমিও এই গাড়ীতে উঠে তখন থেকে প্রত্যেক স্টেশনে নেমে নেমে কামরায় কামরায় বন্ধুটিকে গোরু খোঁজা করে বেড়াচ্ছি—কিন্তু গাড়ীও কি ছাই এধারকার ইষ্টিশনগুলোয় এক মিনিটের বেশী দাঁড়ায়।" বক্‌তে বক্‌তে ব্যাগ হাতে ব্যগ্র হয়ে তিনি নেমে পড়লেন—গাড়ী ছাড়বার ঠিক আগের সেকেণ্ডে।

কেনাকাটার ব্যাপার

"আপনাদের নার্সারী তো শুনেছি বেশ নাম করা। আমি এসেছিলাম কিছু ফুল—"

"হ্যাঁ, পাবেন। ফুল—সব রকমের ফুল পাবেন এখানে। ফুল, ফুলগাছের চারা। ফুল-ফল-শাকসব্জীর সবরকম বীজও এখানে মেলে। ফুলকপি-বাঁধাকপির বীজও পাবেন আমাদের কাছে। কী চাই আপনার?"

"ফুলকপির বীজ পাওয়া যায় নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কতো চাই? তিন আনার প্যাকেট, না, ছআনার? ছআনার প্যাকেটে তিন আনার তিন গুণ থাকে। বীজের সঙ্গে কিছু সারও আপনার দরকার হবে আশা করি।"

"সার? না সারের কথা আমি কিছু ভাবিনি—"

"আপনার থেকেই আসে। বীজের সঙ্গে সার—অবিচ্ছেদ্য! বীজের কথার পরেই সারের প্রশ্ন। এমন কি অনেকের কাছে সারের কথাই হচ্ছে আসল কথা। গোড়ার কথা। তা, সারও আমরা আপনাকে যোগাতে পারব। পাঁচ সের কিংবা দশ সের থলেয় পাবেন, আধমণি বস্তায়ও পাওয়া যায়। দাম পড়বে আপনার—"

"সার-কথা আপাততঃ থাক। আমি চাইছিলাম—"

"না মশাই, সারের কথা মোটেই মুলতুবি রাখা যায় না। ফুলকপির ভাল ফলন পেতে হলে, বড় সাইজের কপির বাসনা মনে থাকলে—তার মূলে চাই সার। অ-সার কৃষিকর্মে কোনোই লাভ নেই।"

"সে কথা ঠিক, কিন্তু—"

"খুরপি আছে আপনার?"

"খুরপি? না তো।"

খুরপিও চাই যে। ভাল করে মাটি কুপিয়ে তারপরে তো ফুলকপির বীজ বপন করতে হবে। ভাল খুরপি না হলে মাটি কোপাবেন কিসে? খুরপিও একটা চাই আপনার, তা ছ-সাত টাকার মধ্যেই একটা খুরপি আপনাকে আমরা দিতে পারব। আপনার বাগানের জমি কেমন? বেশ নরম তো?"

"বাগান? বাগান তো আমার নেই।"

"বাগান নেই তো কপি ফলাবেন কোথায়? অবশ্যি বাড়ির ছাদেও পুরু করে মাটি ফেলে ফলানো যে যায় না তা নয়—সে রকম মাটি সরবরাহের ব্যবস্থাও আমরা করতে পারি। তাহলে ছাদের মাপটা দেবেন আমাদের। মাটির দর পড়বে আপনার প্রতি বর্গফুটে —যদি সারালো মাটি পেতে চান—"

"কী বলছেন আপনি?"

ঠিকই বলছি। তবে বলি কি, মাটি ফেলাফেলির অত হাঙ্গামায় কাজ কি? বাগানবাড়ীও তো ভাড়ায় কিংবা লীজে নিতে পারেন? সব্জী বাগান করার উপযোগী ভাল বাগান বাড়ীও আমাদের সন্ধানে আছে, ভাড়াও তেমন কিছু বেশী নয়। ন্যায্য ভাড়াই। তবে কিছু সেলামি লাগবে আপনার—"

"সেলামি?"

"হ্যাঁ, সেলামি তো লাগেই আজকাল। বাজারের রেওয়াজ তাই যে। সেলামী ছাড়া বাড়ি আর সেলট্যাক্স ছাড়া মাল— পাচ্ছেন কোথায় এখন? তা বাড়ীওয়ালাকে বুঝিয়ে কমসম করে হাজার টাকার মধ্যেই রফা করা যাবে আশা করি। ভেবে দেখুন, বাড়ির সঙ্গে যদি ভাল একটা বাগান আপনি পান—"

"আজ্ঞে—"

"বাগান পেলে আর আপনার ফল-ফুলুরির দুঃখু? তখন কেবল কপি কেন, আম জাম লিচুও আমদানি করতে পারবেন—। কোনই বাধা নেই। ভালো আমের চারাও আমরা যোগাই। চারা—কলম—যা চান। বোম্বাই আম, দানাপুরের ল্যাংড়া, মালদার ফজলি, মজফ্ফরপুরের লিচু, টালিগঞ্জের গোলাপ খাস,—এছাড়া কিসিন ভোগ—"

"কিন্তু—"

"কিন্তু কাকের দিকে নজর রাখবেন। কড়া নজর।"

"কাকের দিকে?"

"হ্যাঁ, কাক। কাকই হচ্ছে ফলের দুষমন্। কাকের জ্বালায় লিচু তো মশায় পাকতেই পায় না। তার জন্যে চাই জাল। গাছের মাথায় জালের ঘেরাটোপ্—ব্যাস, আপনি নিশ্চিন্দি। গাছের জালও পাবেন আমাদের কাছে। দাম পড়বে—"

'কিন্তু আমি বলছিলাম কি—"

"বুঝেছি, ছেলেদের কথা বলছেন?"

"ছেলেদের কথা? কাদের ছেলে?"

"কাদের আবার? আপনার পাড়ার।"

"পাড়ার ছেলে তো আমার কী?"

"ঠিক কথা, কিন্তু পাড়ার ছেলেরা যে লিচু পাড়ারও একটি। কম ওস্তাদ কি? জাল টাঙিয়ে তো কাকের ভ্যাজাল থেকে বাঁচলেন, কিন্তু ওই ছেলেরা। তারা কি আপনার লিচু পাকতে দেবে—কিংবা পাকতে দিলেও থাকতে দেবে? আপনার বাগান, আর তাদের হচ্ছে বাগানো। তবে তারও প্রতিবেধ আছে। তার জন্য চাই বেড়া—বাগানের চার ধারে ঘেরাও করে কাঁটা তারের বেড়া।"

"কাঁটা তার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ তাও পাবেন আমাদের কাছে। দাম পড়বে—"

"দামের কথা থাক। শুনুন—"

"দাম আমরা বেশী নেবো না। নিইনে কারো কাছেই। সেল ট্যাক্সেই আমাদের পুষিয়ে যায়। যা বাজার দাম তাই দেবেন। তবে বলি কি, কিছু যদি মনে না করেন, কেবল শুধু শাক-সব্জী বা আম-জাম না করে—সেই সঙ্গে কিছু খাদ্যশস্যেরও চাষ করলে কি হয় না? ভালো হয় না কি? বাগানের এক ধারেই ইচ্ছে করলে ধানের আবাদও তো করতে পারেন।"

"ধানের আবাদ?"

"হ্যাঁ, তার দ্বারা দেশের সেবা করা হবে। দেশব্যাপী খাদ্য সমস্যার সমাধানে কিছুটা সহায়তাও করা হবে। সেটা আপনার নাগরিকের কর্তব্যও বটে, সরকার থেকে 'ফসল আরও ফলাও' করার জন্য কতো চেষ্টা চলছে। নিশ্চয়ই তা আপনার অবিদিত নেই। রাজধানীর মাটিতে ফলাবার উপযোগী নতুন ধরণের এক রকম ধানের বীজ আমরা আমদানি করেছি, তার নাম রাজধান। আমেরিকা থেকে আনানো একেবারে টাট্‌কা।"

"বলেন কি?"

"বলছি কি তবে? কিন্তু মশাই, ধানের চাষ চাট্টিখানি না। তার জন্যে চাই হাল-বলদ, তা ছাড়া, ধেনো জমির সারও আবার আলাদা। তবে সারের জন্য ভাববেন না স্যার, সব রকমের সার পাবেন আমাদের নার্সারীতে—"

"বুঝতে পেরেছি আপনাদের নার্সারী বেশ সারগর্ভ, কিন্তু মশাই, আমার—"

"আজ্ঞে; আপনাদের আশীর্বাদে কিছুর এখানে অভাব নেই। হালও আমরা বানিয়ে দিতে পারব—উচিত দাম পেলে। আর হাল, ধরতে কারও লজ্জার কিছু নেই এখন। লাট-বেলাটরা পর্যন্ত হাল ধরছেন আজকাল। রাজ্যের হাল তো ধরেই ছিলেন, এখন তাঁরা হালের রাজ্যে। আর দেখছেন তো আজকালকার চাকরি-বাকরির হাল? ভদ্রলোকের ছেলের পক্ষে এখন—"

"হালের খবরের কাজ কি আমার ?"

"বলদের খবর চাইছেন ? ঐখানেই মশাই একটু গোল আছে। বলদ তো আর রাতারাতি বানানো যায় না। অবশ্যি, বলদ অভাবে রাজকোটের এক চাষা—ভালো কথা, আপনি কি বিবাহিতা ?"

"কেন বলুন তো ?"

বুদ্ধি করে বিয়ে করে থাকলে মুশকিলের আসান করেই রেখেছেন বলতে পারি। রাজকোটের এক চাষা গোরুর বদলে নিজের বউকে লাঙ্গলে জুড়েছিল—পড়েন নি খবরের কাগজে ? তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনি কি—মানে, আপনার বৌ আছেন নিশ্চয় ?"

"আমাকে তো বলতেই দিচ্ছেন না মশাই। আমি এসেছিলাম আমার বোনের জন্যে রজনীগন্ধা ফুল কিনতে। গোটা দশ বারো হলেই হোতো। তা আছে আপনার কাছে ?"

মানতুর খবরদারি

খবর দেয়া কি সহজ কথা? কথায় বলে, খবরদারি। খবরদার —কথাটার দুটো মানে, এক হচ্ছে যে খবর দেয়। আরেক হচ্ছে, সাবধান। তার মানে খবর দেবে খুব সাবধান হয়ে।

মানে কিনা, খবরাখবর। খবরের সঙ্গে অখবর, সংবাদের সঙ্গে দুঃসংবাদ জড়ানো থাকে। সেইজন্য তা কায়দা করে ফাঁস করতে হয়। আসল কথাটা আস্তে আস্তে ভাঙাটাই হচ্ছে দস্তুর।

সিধুর মাসির কাছে কি করে খবরটা দেবে সারা পথ ভাবতে ভাবতে এসেছে মানতু। মাসি নাকি ভারী কড়া মেয়ে, আর খবরটাও তেমন মিঠে নয়। এই মিঠে-কড়া সংবাদ কি করে যে মেটানো যায়! ভালো দায় নিয়েছে সে নিজের ঘাড়ে।

দরজায় কড়া নাড়তেই মাসি এসে হাজির।

'আপনি কি ক্যান্ত মাসি?' জিগেস করেছে মানতু।

'সিধু—আমাদের সিদ্ধেশ্বরের মাসি তো আপনি? সিধু আজ বাড়ি ফিরতে পারবে না।'

'কেন কী হয়েছে?'

বাড়ি ফেরার তার শক্তি নেই। শনিবার আজ—শনিবার দুটোর সময় অফিসের ছুটি হয় জানেন তো? তার ওপর আজ আবার মাসকাবার। মাইনে পেয়ে যেই না সে ফুর্তির চোটে লাফ দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে—পড়বি তো পড় —একেবারে এক চলন্ত মোটরের সামনে—'

'চাপা পড়েছে নাকি?—অ্যাঁ!' আঁৎকে ওঠেন মাসি।

'না, পড়েনি। মোটরটা তখন ব্যাক্ করছিল—তাই রক্ষে। মোড় ঘোরাচ্ছিল গাড়িটার। কিন্তু ঘুরিয়ে নিয়ে সামনে আসতেই দেখা গেল গাড়ির মধ্যে দুটো মুশ্‌কো মুশ্‌কো লোক। দুটি মিচ্‌কে শয়তান। সিধুকে দেখতে পেয়ে তারা নেমে এলো গাড়ি থেকে—'

'সেই শয়তানের মত লোকদুটো?'

'হ্যাঁ, যমদূতের মত চেহারা। সিধে চলে এল সিধুর কাছে…'

'মেরে-ধরে সব কেড়ে-কুড়ে নিয়েছে তো?'

'কাছে আসতেই সিধু চিনতে পারলো তাদের। পিণ্টু আর পটলা। তাদের তাসের আড্ডার পিণ্টু আর পটল।'

'পিণ্টু আর পটল তো আমার কী?' ক্ষ্যান্ত মাসি জানতে চান।

লোকে পটল তোলে, কিন্তু পটলই সিধুকে তুললো। তুলে নিলো নিজের গাড়িতে। বললো চিনেবাজারে জুতো কিনতে যাচ্ছি, চ আমাদের সঙ্গে। বলে তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেই না বোঁ করে রাস্তার মোড় ঘুরেছে—'

'অমনি বুঝি একটা লরি?'

'ঘুরতেই বেণ্টিংক স্ট্রিট। চীনে মুচিদের সারি সারি জুতোর দোকান। দোকানে ঢুকে জুতোর দর করতে গিয়ে দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়া বেধে গেল সিধুর। সিধু বললে, তোমার জুতো বিলকুল পিজবোর্ড। বলতেই ক্ষেপে গেল চিনেটা। একটুতেই ওরা ক্ষেপে যায়—চীনেরা ভারী মারখুনে জাত—কথায় কথায় ছোরা ছুরি হাঁকড়ায়—'

'দিয়েছে তো বসিয়ে?'

'বসিয়ে? না, উঠিয়ে দিলো দোকান থেকে। জুতো জোড়া ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বললে, জুতো কিনে তোমার কাজ নেই। জুতো না কিনে রসগোল্লা খাওগে। জুতো না কিনে রসগোল্লা খেতে বলল, নাকি, জুতো না খেয়ে রসগোল্লা কিনতে বলল—মানে, কী যে বলল—রসগোল্লা না কিনে জুতো খাও।

নাকি, জুতো না খেয়ে রসগোল্লা কেন, নাকি, জুতোও খাও—রসগোল্লাও খাও—কী যে বলল—তা আমি ঠিক বলতে পারব না। মোটের ওপর দোকান থেকে ভাগিয়ে দিল ওদের—'

'জুতো মেরে?'

'জুতো না মেরে দোকান থেকে বেরিয়ে পিন্টু বলল, ঠিক কথাই বলেছে চীনেটা। চল কোথাও গিয়ে ভালো-মন্দ কিছু খাওয়া যাক। কাছেই ছিল একটা আপিস ক্যানটিন—সেখানে তারা খেতে গেল। আপিসটার চারতলার ওপরেই রেস্তরাঁটা—কিন্তু তার সিঁড়িটা এমন নড়বোড়ে যে—'

'ভেঙে পড়লো বুঝি হুড়মুড় করে?' মাসিমার আশঙ্কার সীমা থাকে না।

সিঁড়ি ভেঙে তারা উপরে উঠলো। সেই চারতলার মাথায়। ছাদের উপরে। ছাদের এক ধারটায় সিঁড়ির লাগাও একখানা ঘর আছে—সেইটেই ক্যানটিন। বাকীটা খোলা ছাদ। সেধারে কোনো বারান্দার মত নেই। সর্বদাই পড়ে যাবার ভয়। সেধারে দাঁড়ালে গা ছম্‌ছম্‌ করে—একবার যদি পা হড়কালো তো চারতলার নীচে—পীচের রাস্তায়—ছাত থেকে পড়ে একেবারে ছাতু...'

'পড়েনিতো কেউ ছাত থেকে পিছলে—সেই পীচের রাস্তায়?'

তাও বলি মাসি, ছাতেও কিছু কম পীচ নেই। পানের পীচে ভর্তি ছাত। ছাতেও তোমার বেশ পিচকারি। তা, পিণ্টুটা কলা খাচ্ছিল আর খোসা ছড়িয়ে ফেলছিল চারধারে। সিধু আপত্তি করল—খোসাগুলো অমন করে যেখানে-সেখানে ফেল না—ওগুলি হেলাফেলার জিনিস নয়। বলল যে, কলাকারু বলে একটা কথা আছে বটে, কিন্তু কলার খোসা কারু না। তার ওপর কারু পা পড়লে আর রক্ষে নেই। এমনকি, তোমার ঐ খোসার জন্তেই হয়ত ছাত থেকে—হয়ত বা পৃথিবী থেকেই খসতে হতে পারে

কাউকে। শুনে পিণ্টু বলল—যা যা, তোকে আর কলার খোসামোদ করতে হবে না।

'কলার খোসামোদ ?' ক্ষ্যান্তমাসি হাঁ করে থাকেন, বুঝতে পারেন না।—'কলার খোসামুদি কেউ করে নাকি ? কলা কি রাজা-উজির ?'

'কলার খোসা নিয়ে আমোদ করা আর কি। ফেলিসনে খোসাগুলো অমন করে—বলতে না বলতে পটল তুলল।'

'অ্যাঁ, হার্টফেল করলো নাকি গো ? বলচো কি তুমি বাছা ?' ক্ষ্যান্তমাসি ককিয়ে ওঠেন—'পটল তুলল আমার সিধু ?'

'পটল সেই খোসাগুলো তুলল। পটল ওরফে পট্‌লা। তুলে ছাদের একধারে রেখে দিল। আর পিণ্টু বললো সিধুকে—কলাগুলো বেশ কিন্তু। আরো কলা খাওয়া। মাইনে পেয়েছিস তো আজ ? সিধু বললো—যতো খেতে পারিস খা। কাঁদি কাঁদি। কলা খাইয়ে কাঁদিয়ে দেব তোকে। তারপরে তারা ক্যানটিনে বসে চপ-কাটলেট সাঁটবার পর ছড়া ছড়া কলা গিলতে লাগলো তিন-জনায়। ছাতময় খোসার ছড়াছড়ি—।'

পটলা আবার তুললো খোসাগুলো ? মাসি জানতে উৎসুক হন।

তার দায় পড়েছে। তারপরে তারা দুজনে মিলে সিধুকে ধরে নিয়ে গেছে তাসের আড্ডায়। সেখানে গিয়ে—দরজায় খিল এঁটে—চারধার বেশ করে বন্ধ করে—

'গুম করে রেখেছে নাকি সিধুকে ?'

'খেলায় বসেছে তারা। ব্রিজ খেলায়...'

এই পর্যন্ত বলে মানতু নিজেই গুম হয়ে থাকে। এর পরের শোচনীয় বার্তাটা কি ভাবে ব্যক্ত করবে তার ভাষার খোঁজ করে। দুঃসংবাদ দেয়ার নিয়ম এই যে তা আস্তে আস্তে ভাঙতে হয়। দুর্ঘটনা যেমন একলা আসে না, একে একে, একটার পর একটা এসে—সইয়ে সইয়ে অসহ্য দশায় নিয়ে যায়—অসহনীয় খবরের

বেলাও সেই একাদিক্রম। দুঃসংবাদ দানেরও দফাদারি আছে। দফায় দফায় রফা করে শেষ দফায় দফারফা করা।

'ব্রিজ খেলায় বসেছে সিধুরা। ব্রিজ খেলা কি রকম জানো মাসি। তোমাদের সেই সেকেলে গেরাপু খেলা না। গোলাম চোরও নয়। এ হচ্ছে বাজি রেখে খেলা। বারোটা বাজিয়েও খতম্ হবে না।—রাত-ভোর চলবে খেলা! এখন অব্দি সিধুর হার হচ্ছে খেলায়—বেজায় রকম হারছে সিধু—হেরে হেরে ঢোল হচ্ছে। মাসকাবারের মাইনে প্রায় কাবার। সিধু যেন কি রকম হয়ে গেছে। খেলার নেশায় প্রায় পাগলের মতন। সে বলছে, যে-মাটিতে পড়ে লোক, ওঠেও সেই মাটি ধরে। যে-খেলায় টাকাগুলো মাটি হোলো তার থেকেই টাকাগুলো তুলতে হবে। টাকা মাটি—মাটি—টাকা। মুক্ত পুরুষের মতই বলছে সে। বলছে যে, হয় বাজি জিতে বেবাক টাকা তুলে বাড়ি ফিরবে নয় তো.সে...' তারপর আর মানতু বলতে পারে না।

'নয়তো কি আত্মহত্যা করবে নাকি?' শিউরে ওঠেন ক্যান্তমাসি।

নয়তো ওর জামা জুতো সব বাঁধা রাখবে। অবিশ্যি, পুরনো পচা জামা কেউ নিতে চাইবে কি না সন্দেহ, কিন্তু জামার সঙ্গে সোনার বোতাম আছে, হাতঘড়িটাও রয়েছে তার। ফাউন্টেন পেনটাও ছিলো যেন—আমার আসার সময় অব্দি ছিল। দেখে এসেছি আমি। কিন্তু ফিরে গিয়ে ফের দেখতে পাবো কিনা জানি না—'

'সিধুকে ফিরে গিয়ে দেখতে পাবে না?'

'সিধুকে দেখতে পাবো বইকি। কে আর তাকে সিন্ধুকে তুলে রাখবে। তবে তার ঘড়ি চেন ফাউন্টেনপেন আর দেখতে পাব কিনা সন্দেহ। যেমন মরীয়া হয়ে খেলতে লেগেছে সিধুটা। আর পাগলের মত ডাক দিচ্ছে—আর সেই সব ডাক ফিরে এসে—বেয়ারিং ডাকের মত ফেরত এসে ডবোল খেসারত দিতে হচ্ছে তাকে।

'কী সব বোনেশে খেলা বাবা!'

'তাই—তাই, সিধু আমায় বলল—মানতু, তুই যা ক্যান্তমাসিকে বলগে যে আজ রাত্তিরে আমি বাড়ি ফিরতে পারবো না—মাসি যেন আমার জন্যে না ভাবে। মাসি যেন মনে করে যে আমি মোটর চাপা পড়েছি কি ছাদ থেকে কলার খোসায় পিছলে পড়ে গেছি পীচের রাস্তায়—কি চিনেম্যানে আমাকে ছুরি মেরেছে—কি অমন ভালোমন্দ কিছু একটা আমার হয়ে গেছে—যাহোক কিছু ভেবে নেয়—আমার জন্যে ভাবতে মানা করিস মাসিকে।'

'আহা, কে যেন সেই মুখপোড়ার জন্যে ভাবতে গেছে। ভাবনার যেন কার দায় পড়েছে। ভেবে মরছে যে কে!'

খ্যান্ খ্যান করে ওঠেন ক্যান্তমাসি। মানতুর আখ্যান শুনে?

সমগোত্র

নাঃ লোকালয় আমার ভাল লাগে না। মানুষের সঙ্গ বিষ। কেউ যদি ডেকে বলে, হ্যাহে হরিহর, আছো কেমন? তোমায় দেখি না কেন হে আজকাল? তাহলেই আমার মেজাজ চড়ে উঠে। ইচ্ছে করে লাগাই এক চড়?

পাছে কেউ গায়ে পড়ে আলাপ জমায় সেই ভয়ে সবার চোখ আমি এড়িয়ে চলি। ফাঁক পেলেই এই জলপাহাড়ে চলে আসি।

জায়গাটা ফাঁকা। বিশেষ করে বর্ষাকালে তো বটেই। এত জল বুঝি-কোথাও পড়ে না, মেয়েদের চোখেও নয়। বর্ষাকালে কেউ আসে না জলপাহাড়ে।

গত বর্ষাতেও এসেছিলাম। কিন্তু বলতে: কি, গত বছরটা আমার তত সুবিধে যায়নি। এমন এক বিচ্ছিরি কাণ্ড বেধেছিল হ্যাঁ, খুব খারাপ কেটেছে গত বছর—কিন্তু যাক্, সে কথা থাকগে......

তাহলেও, ভারী খাসা জায়গা এই জলপাহাড়। চারধার ফাঁকা দূরে দূরে জংলা লতাপাতার তৈরী দু-একটা কুঁড়ে-ঘর জংলীদের বসতি। আর, জংলীরা ভালো। মোটেই ভদ্রলোক নয়। গায়ে পড়ে ভাব জমাতে আসে না, তারা।

একটা সরাইখানা আছে এখানে। অনেকটা পোড়ো বাড়ির মতন। কেউ বড়ো ওঠে না সেখানে, অন্ততঃ, বর্ষাকালে তো নয়ই। কে জানে, সারা বছরই এমনি খালি পড়ে থাকে কিনা! সেই সরাইখানায় আমি থাকি।

খাওয়া-দাওয়ার ভাবনা নেই কোনোও। সারাদিন ঘুরে বেড়ানোই কাজ। একা একা—এখানে সেখানে। বেড়াতে বেড়াতে পাহাড়ের মাথায় খাদের ধার অব্দি চলে যাই। চূড়ার কাছ বরাবর। সেখানে পাথর বাঁধানো বেঞ্চির মত আছে একটা। বসি খানিক। বসে বসে হাওয়া খাই।

খাদের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াই এক এক সময়। বাপ্, কী গভীর খাদটা! চার-পাঁচ শো ফুট তো হবেই। তলার দিকে তাকিয়ে দেখি। ইস, এখান থেকে নড়লে কি কেউ বাঁচে?

সারাদিন এই কাজ। পাহাড়ের মাথায় চড়া, খাদের তলায় তাকানো, পাথরের বেঞ্চে বিশ্রাম, আর আবার আমার সরাইখানার আড্ডায় ফিরে আসা।

দিন কাটে আরামে।

আরামেই কাটছিল। এ পর্যন্ত কোনো ঝঞ্চাট দেখা দেয়নি। এ বছরেও ঠিক গতবারের মতই বিচ্ছিরি আবহাওয়া, বৃষ্টি বাদ্‌লা, একটু থাম্‌লো কি অমনি নামলো। তার ওপর কুয়াসা। এম্‌নি দুর্যোগ যে, জংলীরাও পথে বেরোয় না। কিন্তু আমার বেশ ভালোই লাগে। এই রকম আবহাওয়াই আমার পছন্দ। কোনো মিশুক লোকের সাথে মিশ খাবার ভয় নেই।

সারা দিন ভোর আজ টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি পড়েছে। সন্ধ্যের মুখে জলটা একটু ধরতেই সরাইখানা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সান্ধ্য-ভ্রমণটা সেরে আসা যাক্।

চলে গেলাম পাহাড়ের মাথায়। বসলাম পাথুরে বেঞ্চে গিয়ে। সন্ধ্যে তখন হব হব। ফিরে আলো-আঁধারির মাঝে বসে মেঘলা আকাশের দিকে চেয়ে আছি চুপ্‌চাপ্‌। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি কখন আরেকজন এসে বসেছেন আমার পাশে। বেঞ্চির কোণ ঘেঁসে।

দেখেই মনটা খিঁচড়ে গেল। এমন খারাপ লাগতে লাগলো—কী বলবো! মনে মনে ওর মুণ্ডপাত করলাম।

গোদের ওপর বিষফোড়া—যেমন হয়ে থাকে। মানুষের স্বভাব দোষ যা, আরেকজনাকে পেলে আলাপ জমাতে চায়, কথা না কয়ে থাকতে পারে না। লোকটা হঠাৎ আমার উদ্দেশে বকৃতে আরম্ভ করে ছায়—

'কী বিচ্ছিরি দিন মশাই আজকের!' নাকি সুরে সুরু করেছে লোকটা।

নাকি সুর আর ন্যাকা মানুষ আমার সয়না। তার ওপর বলা নেই কওয়া নেই এই বকামো,—আমি খেঁকিয়ে উঠি। গলা খাঁকারি দিই। তার বেশি কিছু বলি না। প্রথমে ভদ্রভাষাতেই প্রতিবাদ করা উচিত—তাই নয় কি?

'এ রকম বাদলা কক্ষণো হয় না এধারে।' তবুও সে বলে চলে 'গত বছরেও এমনটা দেখিনি।'

শুনে আর আমি স্থির থাকতে পারলাম না। উঠে পড়তে হোলো। লোকটার সান্নিধ্য যেন ছুঁচের মত বিঁধতে লাগলো আমায়। চলে গেলাম ওর আওতা ছেড়ে—একেবারে খাদের ধারে। কিনারার কাছাকাছি।

বাস্তবিক, কেন মানুষ বকতে এত ভালবাসে? কথা বলে কী সুখ পায়? রাতদিন খালি বকর্—বকর্—বকর্ বকর্—কী লাভ হয় বকে? এই বকাসুরদের আমি দুচোখে দেখতে পারি নে। ওদের বকুনি আমার কানে বিষ ছড়ায়।

কিন্তু হতভাগা নাছোড়বান্দা। আমার পিছু-পিছু সেও উঠে এসেছে।

'সরাইখানাও আর সে আগের সরাইখানা নেই।' সে বলে।

লোকটার ব্যাপারে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। —এ—কী গায়ে পড়া অভদ্রতা? এও সরাইখানাতে উঠেছে ভাবতে আরো খারাপ লাগতে থাকে।

একেবারে খানার মুখে গিয়ে দাঁড়াই। কিন্তু না; মুখপোড়া সেখানেও তাড়া করে।

'আপনিও তো ঐ সরাইখানাতেই উঠেছেন?' জিগেস্ করে ও, 'তাছাড়া আর উঠবেনই বা কোথায়? এই জংলা জায়গায় কি থাকবার একটা ভালো আস্তানা আছে। সরাইখানায়ই তো থাকা হচ্ছে মশায়ের?'

ভালো জ্বালা। কোথায় এখন সরাই নিজেকে—অ্যাঁ? খানার মধ্যেই সরাবো নাকি? খাদের তলায় তাকিয়ে দেখি। তলিয়ে দেখতে সাধ হয়। এমন বদ-লোকের পাল্লা থেকে বাঁচতে আত্মহত্যা করাও শ্রেয়ঃ।

'একলা এসেছেন বেড়াতে, না কি সস্ত্রীক?' আমার কোনো জবাব না পেয়েও সে দমে না: 'কেউ কেউ বৌ নিয়েও আসে আবার এখানে।'

তোমার পিণ্ডি চটকাতেই আসে। আমি বলি—মুখ ভেংচিয়ে বলি। অস্ফুট স্বরেই বলি কথাটা।

'আরে মশাই, আমিই এসেছিলাম বৌ নিয়ে এখানে।' সে প্রকাশ করে—বছর দুই আগের কথা।

আমি এবার বড় ডোজের গলা-খেঁকারি ছাড়ি। কারো ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিণীগত কথায় কান দিতে আমার ভালো লাগে না—রূঢ় কণ্ঠে তা জানিয়ে দিতে চাই।

'সেবারও এমনি বাদলা মশাই। এই রকমই কুয়াসা লেগে থাকতো। আমি আর আমার বৌ বেড়াতে আসতাম এই টঙে—বৃষ্টি ধরলে বিকেলে কি সন্ধ্যের দিকটায়। এসে বসতাম ঐ যে দেখলেন—ঐ বেঞ্চে। গল্প করতাম বসে বসে! —লোকটা বকেই চলে—

'আমার বৌ, মশাই, ভারী চুপ্‌চাপ প্রকৃতির—একদম্ না-কথার মানুষ। বেশি কথাবার্তা ভালবাসে না আদৌ। আমি একা একাই গল্প করতাম। ও শুনত। শুনে শুনে বিরক্তি হোতো।'

কোনো দোষ নাই মেয়েটার। —নিজের মনে না বলে আমি পারি না।

'দশ-বারোদিন কাটাবার পর, অবশেষে একদিন—সেদিনও আমরা বেড়াতে এসেছি এইখানে। গল্প করছি আমি···আমার বৌ আর সইতে পারল না।...'

আশ্চর্য নয়! আমার অসহ্য লাগছে।

'এ-কথায় সে-কথায় এই চূড়ার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা।' সে বলতে থাকে—

'এমনি ভর সন্ধ্যে তখন। আমার বৌ করলো কি—ক্ষেপে গিয়ে হঠাৎ···মারলো এক ধাক্কা আমাকে···আমি তখন এই খাদের ধারে খাড়া, ঠিক আপনি যেখানে দাঁড়িয়েছেন এখন। মারলো এক ধাক্কা—' বলতে বলতে বিষণ্ণতায় তার গলার স্বরও খুব নীচ খাদে নেমে এলো—'আর আমি পড়ে গেলাম। একেবারে পাঁচশো ফুট তলায়।'

শুনতে মোটেই ভালো লাগে না, তবু আমায় শুনতে হয়।

'মারা গেলাম আমি, বলাই বাহুল্য। হাড়-পাঁজরা চুরচুর হয়ে গেছলো—চেনবার যো ছিল না। এমন কি, আমর বৌ দেখলেও আমাকে চিনতে পারতো কি না সন্দেহ।'

সে আগেই তোমাকে চিনেছিল হাড়ে হাড়ে, বোকচন্দর!

'তারপর থেকে লোকে বলে আমি নাকি ভূত হয়ে এখানে ঘুরছি। যেদিন আমার অপঘাত হয় ফি-বছর সেই দিনটিতে আমি নাকি এখানে হানা দিতে আসি। এই পাহাড়ের মাথায় এসে যাকে এখানে দেখতে পাই ধাক্কা মেরে ফেলে দিই নাকি খাদের গর্ভে। সেদিন একজনকে না নিলে নাকি আমার স্বস্তি হয় না। লোকে এই বলে।'

বলুকগে, লোকের কথায় আমি কান দিইনে—দিতে চাইনে। তোমার কথাতেও না। তোমরা আমাকে রেহাই দেবে? —আমি

চোখ পাকিয়ে তাকাই ওর দিকে—আমার দুই চোখে দুটি বিরক্ত জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে ওঠে।

'আজ হচ্ছে সেই দিনটি—আমার দ্বিতীয় মৃত্যু-তিথি...বলেই সে আমাকে, বলা নেই কওয়া নেই, এক ধাক্কা লাগায়।

আমি তাকিয়ে দেখি ভালো করে—আরে, সেই তো! সে-ই তো বটে!

সে ধাক্কা মারে। তার ঘুষি আমার দেহ ভেদ করে যায়!

তবু সে মারতেই থাকে। ধাক্কার ওপর ধাক্কা দেয়। শেষটায় হাত চালিয়ে সুবিধে করতে না পেরে গুঁতো মারতে সুরু করে। তেড়ে-তেড়ে এসে গুঁতোয়। তার বদ্‌খৎ চেহারা নিয়ে আমার দেহে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে যায়।

অচেনা লোকদের সঙ্গে আমার কথা কইতে ভালো লাগে না। নইলে আমি তাকে বলতে পারতাম, গত বছর আমাকেই সে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল। স্পষ্ট বলতে পারতাম মুখের উপর।

নাঃ, জায়গাটা ছাড়তে হবে। জলপাহাড়ে আর আসা চলবে না দেখছি। বড্‌ডো ভূতের উপদ্রব এখানে।

যদ্দূর বেয়াড়া হতে হয়!

সেই তার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। সবে তিনি কলকাতায় এসেছেন।

ফুটপাত ধরে হাঁটছি, হঠাৎ চারদিক থেকে একটা 'গেল! গেল'। রব শুনে পিছন ফিরে তাকালাম। আরেব্বাস!

চলমান এক পাহাড় ফুটপাথ জুড়ে বাস-এর মতই বেগে আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে আর কি!

এক লাফে সরে দাঁড়িয়ে নিজের ঘাড় বাঁচিয়েছি।

ভদ্রলোক আমার সামনে এসে চিৎপাত হয়ে পড়লেন ফুটপাতের ওপর।

বিপুল ভুঁড়ির ভার নিয়ে উঠতে পারছিলেন না, আমি তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম।

বললাম 'এটা আমের সীজন্, জানেন? লোকে আম খেতে খেতে যায়, আঁটি আর খোসা ছড়াতে ছড়াতে যায় রাস্তায়। দেখে শুনে পথ চলতে হয় কলকাতায়—সব সময়ই, বিশেষ করে এই সময়টায় আরো।'

'হাসছেন আপনি? আমি খেলাম আছাড় আর আপনার হচ্ছে আমোদ? রোষভরে তিনি বললেন।

'আজ্ঞে না। আমের সঙ্গে যেমনতর খোসা, তেমনি ঐ আমোদও জড়ানো আম খেলে আমোদ হয়। আর খোসায় পা পড়ে পিছলে গেলেও এক রকমের আমোদ লাগে—অবশ্যি যে আছাড় খায় তার পক্ষে ঠিক আমোদের নয়, তা সত্যি। কিন্তু যেভাবেই খান না, আমের সঙ্গে আমোদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।'

'হুম্।' একটুখানি গুম হয়ে থেকে তিনি গুমরে উঠলেন আবার—'আমের সঙ্গে আরো কী কী জড়ানো আপনাদের এই কলকাতায়, শুনি একবার? জেনে রাখা ভালো আগের থেকে। সাবধানের বিনাশ নেই।'

'আমের সঙ্গে জড়ানো আমের আচার। আমের আছাড় খেতে খুব খারাপ হলেও আমের আচার খেতে কিন্তু খাসা। এমন উপাদেয়, এত চমৎকার উম্‌দা চীজ আর হয় না।'

'ভারী আমের খোশামোদ করছেন যে। আমের খোসা থেকে বুঝি আমোদ পেয়েছেন খুব?'

'আজ্ঞে না মাপ করবেন। আপনার আছাড় খাওয়ায় আমি দুঃখিত সত্যি। মহাশয়ের পরিচয়টা জানতে পারি কি?'

'আমি হর্ষবর্ধন। আপনি?'

'আমি শিব্রাম'।

'বর্ধন?'

'আজ্ঞে না, বর্ধিত।'

'বর্ধিত? তার মানে?' তিনি একটু অবাক হন,—'সে আবার কি রকমের উপাধি? এই বর্ধিত?'

'যেমন রক্ষিত হয় না? তেমনি আর কি। রক্ষিতের মতই এই বর্ধিত। খেয়ে না খেয়ে বর্ধিত কিছুটা নিজগুণে, কিছুটা পরের সৌজন্যে।'

'থাকা হয় কোথায়?'

'যত্র তত্র। কলকাতার সব পাড়াতেই আমার আস্তানা। শহরের সব প্রান্তেই আমার মাসিমারা আছেন। আর আমার মাস্তুতো, মামাতো বোনেরাই আমার প্রান্তসীমা। ঐ বোন পর্যন্তই আমার দৌড় মশাই! আর বলতে কি, বেশির ভাগ ঐ বোনের দ্বারাই আমি লালিত পালিত বর্ধিত।'

'আমরাও বন থেকে আসছি। আসামের বন থেকেই। সেখানকার

বনাঞ্চলে আমাদের কাঠের কারবার। বিস্তর টাকা করার পর এখন টাকা ওড়াতে এসেছি এই কলকাতায়। আমরা আসামী।'

'জানি। আসামের বন থেকে টিয়ে পাখির আমদানী হয়। বন থেকে বেরুলো টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে!—কথায় আছে। তা, কোথায় ওঠা হয়েছে আপনাদের এই কলকাতায়?'

'প্রথমে উঠেছিলাম রসা রোডে। সম্প্রতি চেতলায় একটা কাঠচেরাইয়ের কারখানা খুলেছি—সেইখানে আছি এখন। গোবরা বলল, গোবরা মানে আমার ভাই গোবর্ধন, সে-ই বলল, দাদা, এখানে একখানা ব্যবসা ফাঁদা যাক। শুধু শুধু কেন টাকা উড়িয়ে যাই? সেই সঙ্গে কিছু টাকা কুড়িয়েও যাই না কেন এখান থেকে?'

'হ্যাঁ, কলকাতার পাথঘাটে টাকা ছড়ানো!—বলে বটে। কুড়িয়ে নিলেই হয়।' সায় দিই তাঁর কথায়। 'আর চেতলাতেও আমার এক মাসি থাকেন। শালুমাসি।' আমি জানাই।

'আপনার চেতলার ঠিকানাটা দিন তো তাহলে। যদি কখনো কোনো কারণে দরকার-টরকার পড়ে ..

এখানকার কারো সঙ্গে এখনো পর্যন্ত তো জানাশোনা হয়নি তেমন...'

তারপর একদিন হর্ষবর্ধন দেখি হাজির আমার চেতলার ঠিকানায়। ভাগ্যক্রমে শালুমাসির বাড়িতেই আমি ছিলাম সেদিন।

এসেই বলেছেন, 'সর্বনাশ হয়েছে মশাই! আমের থেকে আরেক দুর্ঘটনা হয়েছে, জানেন?'

'আছাড় খেয়েছেন নাকি আবার?'

'না, আমি নই। আমার ভাই। সে-ই।'

'তিনি বুঝি আছাড় খেয়েছেন এবার?'

'না না, আছাড় খাননি। আমের আচারও নয়। আম খেয়েছেন খালি। তার তাই খেয়ে খেয়ে এখন আমাশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'তাই বলুন। আমাশা? তা তো এখন হামেশাই হয়।'

'তাই হয়েছে। একটু জ্বরও হয়েছে তার ওপর। ডাক্তার দেখানোর দরকার। কিন্তু এখানে তো কোন ডাক্তারের সঙ্গে জানাশোনা নেই আমার। তাই ডাক্তারের খবর নিতে এলাম আপনার কাছে।'

'চেতলায় তো রাম ডাক্তার। তিনি এখানকার সবচেয়ে নামজাদা।' আমি জানালাম—যেমন নাম ডাক, তেমনি হাতযশ।'

'তাকেই দেখাব তাহলে। তা, কোথায় থাকেন তিনি?'

ঠিকানা দিলাম। দিয়ে বললাম, 'ডাক্তার তো ভালই, কিন্তু বড্ডো খামখেয়ালী। ওঁর চালচলন একটু অদ্ভুত। কিন্তু তাইতে ঘাবড়াবেন না যেন। রোগ আরাম করতে তিনি ওস্তাদ।'

'রোগ সারানো নিয়ে কথা। ডাক্তারের চালচুলোর খবর নিয়ে কি করব?'

আমার কাছে রাম ডাক্তারের বাড়ির হদিস জেনে নিয়ে হর্ষবর্ধন তো গেছেন। গিয়ে চেম্বারের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কড়া নেড়েছেন—'রামবাবু ডাক্তার বাড়ি আছেন? রাম ডাক্তারবাবু বাড়ি আছেন কি?' ডাক্তারবাবু কি বাড়িতে রয়েছেন?

তাঁর হেঁড়ে গলার হাঁকড়ানিতে একজন মুখ বাড়িয়েছেন—'কাকে চাই?'

'রাম ডাক্তারবাবুকে। রামবাবু ডাক্তারকে। ডাক্তারবাবু রামকে।' তিনি জানান।

'ভেতরে আসুন।'

ভেতরে যেতেই 'কী কেস?' প্রশ্ন করা হয়েছে তাঁকে।

'না কোনো কেস নয়।' জবাব দিয়েছেন হর্ষবর্ধন—'কেস থাকলে তো উকীলের কাছেই যেতাম। ডাক্তারের কাছে আসব কেন?'

'মানে হয়েছে কি?'

'আজ্ঞে আমাশা। তার ওপর একটুখানি জ্বরের মতও আবার।'

'নিন, শুয়ে পড়ুন। শুয়ে পড়ুন চট করে।' আর একটি কথাও কইতে না দিয়ে কোনো আপত্তি গ্রাহ্য না করে ধরে বেঁধে তাঁকে বেঞ্চির ওপরে শুইয়ে দেওয়া হয়।

তবুও, শুয়ে শুয়েই তিনি প্রতিবাদ করতে যান। কিন্তু তাঁর কথায় কান না দিয়ে তাঁর মুখে থার্মোমিটার গুঁজে দেওয়া হয় তারপর।

তারপরেও থার্মোমিটার মুখে করেই তিনি মুখ নাড়তে যান, কিন্তু অপর পক্ষ থেকে দারুণ বাধা আসে।

না, না! আর একটিও কথা নয়। চুপটি করে শুয়ে থাকুন। আপনার জ্বরটা দেখা যাক আগে।'

তথাপি তিনি একটু বাঙনিষ্পত্তির চেষ্টা করেন,—'ম্-ম্-ম্-মাজ্ঞে……!'

'জ্বরের কাঠি মুখে নিয়ে কথা বলতে যাবেন না। ওটা ভেঙে গেলে, ভাঙবার পর যদি গিলে ফেলেন, ভেঙে গিয়ে যদি পেটের মধ্যে চলে যায়, তখন একেবারে ডাক্তারের একতিয়ারের মধ্যে চলে যাবে। সার্জনের দরকার পড়বে তখন। পেট কেটে বার করতে হবে ঐ থার্মোমিটার। অতএব, সাবধান! একটি কথাও নয় আর।'

অসহায়ভাবে শুয়ে থাকেন হর্ষবর্ধন।

'আমাশা হয়েছে বললেন না? আমাশা? সাদা আমাশা, না রক্তামাশা?

থার্মোমিটার মুখে নীরবে ঘাড় নাড়েন হর্ষবর্ধন—কি বোঝাতে চান তিনিই বোঝেন।

'আমাশায় তো এমিট্রিন ইন্‌জেক্‌শন দেয় জানি। দেখি, দেরাজের কোথাও আছে কিনা দাবাইটা।'

ওষুধের আলমারির ভেতর থেকে এমিট্রিনের অ্যামপিউলটা বার করে ইন্‌জেক্‌শনের সিরিঞ্জে ভরা হয়।

মুখটি বুজে জুলজুল করে তাকিয়ে দেখেন হর্ষবর্ধন।

'দেখি হাতখানা।'

হর্ষবর্ধনের হাতখানা করায়ত্ত করে তার বাহুমূলে সিরিঞ্জের ছুঁচটা বসানো হয়। হর্ষবর্ধন থার্মোমিটার মুখে গোঁ গোঁ করেন। কী আর করবেন ?

'উঁহু উঁহু। নড়বেন না। স্থির হয়ে থাকুন। ইন্‌জেক্‌শনের সময় নড়াচড়া করতে নেই। সিরিঞ্জের ছুঁচ ভেঙ্গে যদি ভেতরে থেকে যায়, সে আবার আরেক ফ্যাসাদ। তার জন্য সার্জন ডাকতে হবে না অবশ্যি, ছুরি চালিয়ে আমি বার করতে পারব। কিন্তু কাটাকুটির হাঙ্গামা আছে ত। কম হয়রানি নয়।'

অগত্যা হর্ষবর্ধনকে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে থাকতে হয়।

ইন্‌জেক্‌শনটা ঠুকে দেবার পর সিরিঞ্জটা তুলে নিয়ে ওর মুখ থেকে জ্বরকাঠিটা খুলে নেওয়া হয়।

থার্মোমিটারটা মুখের বার হতেই হর্ষবর্ধন হাঁ করেন। হাঁপ ছাড়েন। হাই তোলেন।

সেই ফাঁকে একটা ইয়া ওষুধের গুলি তাঁর মুখগহ্বরে ফেলে দেওয়া হয়—'নিন, গিলে ফেলুন চট্ করে। ওষুধটা পেটে গেলে উপকার হবে।'

'ছি ছি ছি! কী বিচ্ছিরি ওষুধ। মুখটা তেতো হয়ে গেল আমার। কী দিলেন আপনি ? বিষ ?'

'কেন, কুইনিন কখনো খাননি নাকি ? জ্বর হলে কি খেতে দেয় ? কি খেলে জ্বর আটকে জানেন না ? তাই দিয়েছি।'

'গলায় আটকায় গেছে আমার। গলার থেকে তলা পর্যন্ত সব তেতো হয়ে গেছে। জিভের ওপরতলা নিচেরতলা সব।'

বিচ্ছিরি মুখ তাঁর আরো বিচ্ছিরি আকার ধারণ করে।

'না, জ্বরটর নেই এখন।' থার্মোমিটার পরীক্ষা করে তিনি জানান—যাক, তাতে অবশ্যি কোনো ক্ষতি হবে না। জ্বর সারাতে

যেমন আটকাতেও তেমনি—এই কুইনিন। রোগের প্রতিষেধ রোগ সারানোর চাইতে ভালো জানেন তো ? এখন বলুন তো, কি বলতে চাইছিলেন আপনি ?'

'বলতে চাইছিলুম যে, জ্বর আর আমাশা আমার হয়নি—হয়েছে আমার ভাইয়ের। আমি আপনার রোগী নই।'—মুক্তিলাভ করার পর মুখ ফুটল ওর।

'আপনি রোগী নন ?'

'আজ্ঞে না।'

যাক্ তাতে আর কি হয়েছে ? আমিও কোনো ডাক্তার নই ভাববেন না।'

হর্ষবর্ধন শুনে হতবাক্ হন : 'সে কি ! আপনি রামবাবু ডাক্তার নন ? রাম ডাক্তারবাবু নন আপনি ? অ্যাঁ ? আপনি কি ডাক্তার রামবাবু নন নাকি ?'

'আজ্ঞে না। ডাক্তারবাবু কাছেই কোথায় কি একটা কাজে বেরিয়েছেন। আমায় বসিয়ে রেখে গেছেন চেম্বারে। আর বলে গেছেন কোনো রোগী-টোগী এলে তার দেখাশোনা করতে।'

'অ্যা ? আপনাকে বলে গেছেন রোগী দেখতে ?'

'হ্যাঁ। সেইজন্যেই আপনাকে আমি দেখেছি। উনি যেমন যেমনটি করে দেখে থাকেন, আমিও ঠিক তাই তাই-ই করেছি। আমাশায় উনি এমিটিন ইন্‌জেকশন দিয়ে থাকেন আমার নিজের চোখে দেখা—আমিও তাই ঠুসে দিয়েছি আপনাকে।'

'ঠুসে তো দিয়েছেন, এখন আমার যদি কোনো ক্ষতি হয় ? তাহলে ?'

'ক্ষতি আর কি এমন হবে। মারা তো যাননি, দেখতেই পাচ্ছি। ঐ ওষুধে বড়জোর আপনার রক্তামাশা হতে পারে না হয়।'

'যদি কোনো শক্ত রোগ হয় আমার ?' হর্ষবর্ধন রীতিমত বিপন্ন বোধ করেন।

'রোগ হলে তো ডাক্তারবাবু রয়েছেনই !' লোকটি অম্লানবদনে আশ্বাস দেয়—'সব রকম রোগ আরাম করতে আমাদের রাম ডাক্তারের জোড়া হয় না, এ তল্লাটে তিনি অদ্বিতীয়।'

বেখাপ্পা কথাবার্তায় ভীষণ খাপ্পা হয়ে হর্ষবর্ধন শুধোন, 'কিন্তু আপনি কে মশাই, শুনি একবারটি? বলা নেই কওয়া নেই, ধরে বেঁধে শুইয়ে মুখে থার্মোমিটার পুরে দিয়ে ইয়া লম্বা এক পিচকারী দিয়ে কি একটা কাণ্ড করলেন বলুন ত? কে আপনি?'

'আমি ডাক্তারবাবুর বেয়ারা।' বলল সেই লোকটা—'তাঁর ওষুধপত্রের ব্যাগট্যাগ আমিই বয়ে বেড়াই।'

'কৃতার্থ করেন! কিন্তু এই যে কাণ্ডটা করলেন, এটা কি আপনার উচিত হলো, বলুন। বেয়ারা হয়ে এই ডাক্তারি করাটা...।'

'কেন নয় বলুন আপনি। ভৃত্য হয়ে মনিবের স্বার্থ দেখা কি আমার কর্তব্য নয়। আমি যদি রোগ না বাড়াই তো ডাক্তারবাবু তাহলে সারাবেনটা কি!

'তা তো বুঝলুম! কিন্তু এই যে এখন আমার মাথা ঘুরছে, হাত-পা কাঁপছে, বুক ধড়ফড় করছে, গা বমিবমি করছে—তার কি হবে? আমি অজ্ঞান হয়ে যাব বোধহয়। আমার পক্ষাঘাত হয় কি না কে জানে।'

'একটুখানি ঠাণ্ডা জল খান, চাঙ্গা হয়ে উঠবেন এক্ষুণি। এই নিন খেয়ে ফেলুন দেখি ঢক ঢক করে...না, না, ভয় নেই, কোনো ওষুধবিষুধ মেশানো হয়নি—খাঁটি জল। কর্পোরেশনের কলের।'

জল খেয়ে হর্ষবর্ধন সন্দেহ প্রকাশ করলেন—'খাঁটি জল বলছেন? ওষুধবিষুধ কিছু মেশাননি বলছেন? কিন্তু কলের জল তো এমন মিষ্টি হয় না।'

'একটুখানি গ্লুকোজ-ডি মিশিয়ে দিয়েছি কিনা। সরবতের মতই খেতে, তাই না? এটা খেয়ে গায়ে বল পাবেন। আমি ত হরদম্ খাই মশাই।'

উদাহরণস্বরূপ শ্রীমান্ বেয়ারা আরেক গ্লাস ঐ পানীয় তাঁর সামনেই পান করে'।

তারপর হর্ষবর্ধন টলতে টলতে আমার কাছে আসেন। এসে কাতরান—'আমাকে একটা হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের ঠিকানা বাতলান তো মশাই!'

'কেন, কি হয়েছে?'

'হোমিওপ্যাথিতে কোনো ইন্‌জেক্‌শন ফিন্‌জেক্‌শন নেই তো?'

'তা তো নেই, কিন্তু কেন?'

'তার এক ডিসপেনসারি ওষুধ গিললেও কিচ্ছু হয় না। আমি একবার বাবার বাক্সভর্তি সব হোমিওপ্যাথি ওষুধ একটা গেলাসে ঢেলে একসঙ্গে গুলে খেয়ে ফেলেছিলাম—কিচ্ছু হয়নি আমার।'

'কিচ্ছু হয়নি? বলেন কি?'

'একেবারে কিচ্ছু হয়নি, তা অবশ্যি বলা যায় না। বাবার গালমন্দ চড়চাপড় যা হবার তা হয়েছিল'—হর্ষবর্ধন অকপটে অপ্রিয় সত্য বিবৃত করেন—'কিন্তু তাতে আমার এমনধারা সর্বনাশ হয়নি।'

'কি সর্বনাশটা হোলো শুনি তো?'

এখনো হয়নি, কিন্তু হবে নির্ঘাত। হতে বসেছে। আসন্ন বলতে পারেন।'

'কি আসন্ন বলুন না মশাই!' আমি ব্যগ্র হয়ে উঠি।

কলেরা কি পক্ষাঘাত, একটা কিছু হবেই আমার। আরম্ভ হয়েছে। হোলো বলে। আমার গা-হাত-পা কাঁপছে, গা বমিবমি করছে, মাথা ঘুরছে। চোখের সামনে অন্ধকার দেখছি!'—হর্ষবর্ধন অর্ধনিমীলিতনেত্রে বসে পড়েন।

'ব্যাপারটা কি হয়েছে খুলে বলুন না। রাম ডাক্তারের কাছে গেলেন ত...তারপর?'

তারপর রাম ডাক্তারবাবু ওরফে রামবাবু ডাক্তার ওরফে বাবু

রাম ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে বাড়াবাড়ি যা হয়েছিল, তার আন্তোপান্ত জানা গেল তাঁর কাছে।

শুনে আমি তাজ্জব!

'রামবাবু একজন বেয়াড়া ডাক্তার, তা আমি জানতাম। কিন্তু রামবাবুর বেয়ারাও যে এক ডাক্তার তা তো আমার জানা ছিল না। এ তো ভারী বেয়াড়া ব্যাপার!'—আমি বলি।

'হ্যাঁ, যদ্দুর বেয়াড়া হতে হয়!' বলেই হর্ষবর্ধন মূর্ছিত হয়ে পড়লেন আমার সম্মুখে।

এক দুর্যোগের রাতে

বিদ্যুৎ চমকানোতে ভারী ভয় পায় মেয়েরা। বিশেষ করে পিসীজাতীয় মেয়েরা। যদি পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতায়, কিংবা ইস্কুলের টেক্সট্ বুক পড়েও এ কথাটা আমাদের জানা থাকত তাহ'লে গরমের ছুটিতে মুকুন্দপুরে কখনই আমি মরতে যেতাম না। অজ্ পাড়া-গাঁ মুকুন্দপুরে—সাধারণতঃ পিসীদেরই সেখানে বসবাস।

বাবা বল্লেন,—"যা অনেক দিন ধরে লেখালেখি করছে তরু। তোকে কবে সেই ছোটবেলায় দেখেছে, দেখতে চায় একবার। তারিণীও খুব খুসী হবে। গরমের ছুটিটা সেখানেই কাটিয়ে আয় না কেন? গান্ধীজীও বলেছেন—ব্যাক টু ভিলেজ, তার মানে আবার গ্রামে যাও।"

বাবা দারুণ ভক্ত গান্ধীজীর। আমি প্রতিবাদ করতে চাই—"উঁহু। তা কি করে হয় বাবা? ব্যাক টু ভিলেজ মানে হবে গ্রামের দিকে পিঠ ফেরাও। অর্থাৎ কিনা সহরেও থাক।'

"তাই নাকি?" বাবা মাথা চুলকোতে থাকে—"তা হলে ও দুইই হয়। গ্রামেও থাক, সহরেও থাক।'

মা ঘাড় নাড়েন—"তা কেন হবে? ব্যাক্ টু ভিলেজ মানে হল তোমার পিঠ দাও গ্রামকে, অর্থাৎ কিনা গ্রামকেই তোমার পীঠস্থান কর। তার মানে, গ্রামেই পিঠ দিয়ে পড়ে থাক চিৎ হয়।"

মা-র বাক্যে বাবার উৎসাহ হয় "তবে তো গান্ধীজীর ব্যাখ্যাই ঠিক তা হলে। হুম্!" আমার বাবা নিদারুণ ভক্ত গান্ধীজীর! "গান্ধীর কথা তবে শুনতেই হবে তোকে। তা ছাড়া; এখন আমের সময়, পাড়াগাঁয় আম প্রচুর। কিনে খেতে হয় না, আমবাগানে গিয়ে

হাত বাড়িয়ে দাঁড়ালেই টুপ্ টাপ্ পড়বে। হাতেই এসে পড়বে। মাথাতেও পড়তে পারে। সেই যে রবি ঠাকুরের কবিতাটি—"সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে আম কুড়াবার ধুম'—"

হাত ঝেড়ে মাথা নেড়ে বেশ আবৃত্তি স্থুরু করেছিলেন বাবা। কিন্তু ধূমেই এসে ধুম্ করে তাঁকে থেমে পড়তে হয়। তার পর আর মনে পড়ে না। না বাবার, না আমার। আর মা? কবিতার ধার দিয়েই মা যান না। ও-জিনিস তাঁর দু-কর্ণের বিষ।

যাক্, অবশেষে রাজীই হলাম। গান্ধীজীর কথায় নয়, অনেকটা রবীন্দ্রনাথের আশ্বাসে।

আমের আশায় আমার মুকুন্দপুর আসা। এসেই দেখলাম পিসীরা খুব ভ্রাতুষ্পুত্র-বৎসল হয়, বিশেষ করে পিস্তুত ভাই-বোন যদি না গজিয়ে থাকে। আমার আদর-যত্নের আর অবধি থাকল না। মার কাছেও কখনো এত ভালোবাসা পাই নি। মনে মনেই আমি এর একটা ব্যাকরণ-সঙ্গত সূত্র রচনা করে নিই। মা? মা হচ্ছেন শুধুই মা, সীমার মধ্যে তিনি। কিন্তু পিসীমা? তাঁর পরিসীমা কোথায়?

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। বিদ্যুতের সঙ্গে মেয়েদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়ত আছে, কিংবা কিছু বৈদ্যুতিক অংশও তাঁদের মধ্যে থেকে পাওয়া অসম্ভব নয়—তা না হলে বিদ্যুৎ-চমক স্থুরু হলে মেয়েরাও চম্কাতে থাকে কেন? আমার মাকেও চম্কাতে দেখেছি। বিনি-কেও দেখেছি। কিন্তু পিসীমার মত কাউকে নয়। একটা নেংটি ইঁদুরের সামনেও তিনি অকুতোভয়ে অটল থাকবেন হয় তো,—কিন্তু বিদ্যুৎ চমকালে পিসীমা? তক্ষুণি খান খান্ হয়ে ভেঙে পড়েছেন।

সেই দুর্যোগের রাতের কথা চিরদিন আমার মনে থাকবে। ভাবলে এখনো হৃৎকম্প হয়। 'ক্যালামিটি' কখনো একা আসে না. খাঁটিই এ কথা। সে রাত্রে তারিণী বাবুও বাড়ী নেই (সম্পর্কে

তিনিই আমার পিসেমশাই), পাশের গ্রামে গেছেন; জমিদারের ছেলের অন্নপ্রাশন, তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। ফিরবেন কিনা কে জানে।

বাড়ীতে কেবল পিসীমা আর আমি। কাজেই খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা চুকাতে বেশী দেরী হ'ল না। রাত দশটার মধ্যেই সব খতম। দরজা, জানালা, ছিটকিনি সমস্ত ভালো করে বন্ধ করবার পিসীমার হুকুম হয়ে গেল। আপত্তির সুরে আমি বলি—"দরজায় তো খিল এঁটেছি, কিন্তু যা গরম পিসীমা! জানালাগুলো বন্ধ করলে তো মারা যেতে হবে।"

"গরমে লোক মারা যায় না", পিসীমা বলেন, "চোরের হাতেই মারা যায়, ডাকাতের হাতেই মারা যায়। জানালা খোলা রাখলে চোর-ডাকাত লাফিয়ে আসতে পারে তা জানিস্? তার ওপরে উনি আবার বাড়ী নাই—সামলাবে কে?"

যেন উনি বাড়ী থাকলেই সমলাতে পারতেন! পিসে হতে পারেন কিন্তু চোর-ডাকাতকে ধরে পিষে ফেলবেন এত ক্ষমতা নেই ওঁর! আমার মন্তব্য কিন্তু মনে মনেই আমি উচ্চারণ করি। ততক্ষণে পিসীমা কোন জানালার একটা খড়খাড়ও ফাঁক রাখবেন না।

অন্ধকার ঘরে দারুণ গুমোটের মধ্যে ছটফট করতে করতে কখন একটু তন্দ্রার মত এসেছে, এমন সময়ে—

ক্কড়্—ক্কড়্—ক্কড়্— ক্কড়াৎ···

আচমকা জেগে উঠি। তৎক্ষণাৎ ঘরের অন্য কোণ থেকে পিসী-মার আর্তনাদ শোনা যায়। "মণ্টু! ও মণ্টু!"

"পিসীমা! কি পিসীমা?"

"চৌকির তলায় সেঁধিয়ে যা। দেরী করিস্ নে।"

আমি উঠে বসি। চৌকির তলায় সেঁধুব কেন? চোর-টোর লাফিয়ে এল নাকি? কিন্তু দোর-জানালা তো বন্ধ, ঘর তেমনি

অন্ধকার—আসবেই বা কি করে? কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবতে থাকি।

"ঢুকেছিস্?"

"উহুঁ।"

"ঢুকিস্ নি এখনো? সর্বনাশ করলি তুই। ঢুকে পড় চট্ করে।"

"কেন, কি হয়েছে পিসীমা?"

"এখনো কথা বলে। কি হয়েছে? আকাশে বিদ্যুৎ হানছে যে বাজ পড়ল শুনলি না?—" পিসীমা ক্ষেপে ওঠেন—"এখন কি তর্ক করার সময়? বলছি না ঢুকে পড়তে—"

পিসীমার মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। কড়্—কড়্—কড়্-কড়াৎ—দুম্—দুম্। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলক জানালার ফাঁকে-ফাঁকে ঝলসে ওঠে।

"মরল ছেলেটা! আমাকেও বেঘোরে মারল।" চাপা কান্নার শব্দ আসে।

কি করি? হামাগুড়ি দিয়ে সেঁধোতে হয় চৌকির তলায়। "ঢুকেছি পিসীমা।"—করুণ স্বরে বলি।

"ঢুকেছিস্। আ! বাঁচালি! ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাতের সময় কি বিছানায় থাকতে আছে? শুয়ে পড়িস্ নি তো চৌকির তলায়?"

"নাঃ। হামাগুড়ি দিয়ে আছি।"

"হামাগুড়ি দিয়ে? কি সর্বনাশ! বিদ্যুৎ চমকানোর সময়ে কি কেউ হামাগুড়ি দেয়? হাত-পা গুটিয়ে আসন-পিঁড়ি হয়ে বস।"

উদ্যমের সূত্রপাতেই কিন্তু সংঘর্ষ বাধে। "কি করে বসব? চৌকি লাগছে যে মাথায়।"

"ভারী বিপদ করলে! এই সময়ে আবার চৌকি লাগছে মাথায়!" পিসীমা চেঁচাতে থাকেন, "এই কি মাথায় চৌকি লাগবার সময়? মাথায় করে সোজা হয়ে বস।"

"উহুঁ। মাথায় করা যায় না, বেজায় ভারী যে!" পিসীমাকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করি, "পিসেমশাই আর আমি দু'জনে হলে পারা যেত।"

সত্যি, আমার একার পক্ষে অত বড় চৌকি মাথায় করা অসম্ভব—দস্তুর মত অসম্ভব। আর, কেবল মাথায় করে বসে থাকা।

"কি করছিস, মন্টু—" পিসীমা হাঁক ছাড়েন।

"চৌকির তলাতেই আছি। হাত-পা গুটিয়েই বসেছি। ঘাড় হেঁট করে।"

'ঘাড় হেঁট করে? তবেই মারা গেলি। এই সময়ে মাথা সোজা করে রাখার নিয়ম যে। চৌকির তলাতেই থাকতে হবে, কিন্তু মাথা উঁচু করে থাকা চাই। তোকে নিয়ে কি করি বল্ তো? একে এই দুর্যোগ—চৌকি কাঁধে করার জন্যে এখন তোর পিসে-মশাইকে আমি পাই কোথায়?—"

অকস্মাৎ বিদ্যুতের চমকে পিসীমার বাক্য বাধা পায়। সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ কড়াক্কড়্ আওয়াজ এবং পিসীমার আর্তনাদ।

"হায় মা কালী। হায় মা দুর্গা। কি বিপদ না ডেকে আনছে ছেলেটা, কি করি এখন, হায় মা—"

আমিও মনে মনে বলি, "হায় মা।" দাঁতে ঠোঁট কামড়াই কি করি এখন? ওদিকে পিসীমার চিৎকার, এদিকে দশমণি চৌকি! ঐতিহাসিক ব্যক্তি নই যে অসাধ্যসাধন করতে পারব। অসম্ভব কাজ কেবল ওরাই পারে। আমার কান্না আসে।

আবার বিদ্যুতের ঝলকানি আর বজ্রপাতের শব্দ।

"দেখলি, দেখলি তো? তোর ঘাড় হেঁট করে থাকায় কি সর্বনাশ হচ্ছে! নিজেও মরবি—আমাকেও মারবি তুই—" পুনরায় পিসীমার ফোঁসফোঁসানি সুরু হয়।

"উঠোনে ঘটিবাটি পড়ে নেই তো? তাহলেই অক্কা পেয়েছি। পেতল-কাঁসার বাসনে ভারী বিদ্যুৎ টানে—"

"গিয়ে দেখে আসব পিসীমা ?"

এই তটস্থ দুরবস্থা থেকে যে-কোনও পথে পরিত্রাণের সুযোগ পেতে চাই।

পিসীমা কিন্তু ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, "বাহিরে যাবি তুই ? এই বিপদের মুখে ? কি আক্কেল তোর বল দেখি ? তোর চেয়ে ঘটিবাটির দামটাই বেশী হল ?" একটু থেমেই আবার সেই প্রশ্নাঘাত, "ঘাড় সোজা করলি ?"

চৌকির তলায় থাকা এবং মাথা উঁচু করে থাকা যখন একাধারে সম্ভব নয়, তখন অগত্যা ওর আওতা পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আসি। এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি, এবং মাথা উঁচু করে। উঃ, ঘাড়টা কি টনটনই না করছে। দারুণ গরম চৌকির তলায় প্রাণ একেবারে গলায়-গলায় এসেছিল।

"ঘাড় উঁচু করেই আছি পিসীমা।"—অপকটেই বলি।

"আহা, বাঁচিয়েছিস।" পিসীমার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে।—"লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে, যাদু ছেলে। যা বলি শোন। আজকের ভয়ানক রাতটা কেটে যাক, মা দুর্গা করুন, কাল তোকে পিঠে করে খাওয়াব। এ কি, কি করছিস আবার ?—"

"দেশলাই জ্বালছি লণ্ঠন ধরাব। যা অন্ধকার—"

"কি সর্বনাশ। এই সময়ে কেউ আলো জ্বালে ?" পিসীমা শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন—"আলোয় যে রকম বিদ্যুৎ টেনে আনে এমন আর কিছুতে না নিভিয়ে ফ্যাল্—এক্ষুণি। (কড়—কড়—কড়াৎ—বাম্ বাম্) দেখলি তো, কি করলি তুই।"

"আমি কি করব ? ও তো আপনি হচ্ছে। দেশলায়ে বিদ্যুৎ টেনে আনে কিনা তা তুমিই জান, কিন্তু সৃষ্টি করতে পারে না তো ?" আমি একটু বিরক্ত হয়েই বলি।

"এই কি বক্তৃতা করবার সময় ? তুই কি মরতে চাস্ ? আমাকেও মারতে চাস্ সেই সঙ্গে ?"

আমি চুপ করে থাকি। কি করব?

"সেই সপ্তবজ্র-নিবারণের মন্ত্রটা মনে আছে তোর? চেঁচিয়ে বল্। বজ্রাঘাত থেকে বাঁচতে হলে—ওঃ, কি বিচ্ছিরি রাত। কালকের সকাল দেখতে পাব কি না মা-কালীই জানেন! কই, পড়ছিস্ না?"

"জানিই না তো পড়ব কি?"

"কি মুখ্যু ছেলেটা। এও জানিস্ না? ইস্কুলে কি ছাই শেখায় তোদের? অশ্বত্থামা বলি ব্যাস হনুমন্ত বিভীষণ। কৃপাচার্য দ্রোণাচার্য সপ্তবজ্রনিবারণ॥ ঘন ঘন আওড়া।"

আওড়াতে থাকি। কি আর করব?

শ্লোকপাঠের মধ্যিখানে আর এক দুর্ঘটনা। পিসীমার পোষা বেড়ালটা কখন আমার পায়ের তলায় এসে হাজির হয়েছে। বেড়ালে আমার ভারী ভয়। লাফিয়ে উঠি আমি। বেড়ালের হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টায় বেড়ালের গায়েই পা চাপিয়ে দিই।

"ম্যাও—" মণ্টু-চাপা পড়ে বেড়ালটাও ত্রাহি ত্রাহি করে।—"মিউ—মিয়াও!"

"ধুত্তোর!" অন্ধকারে যে ধারে পা বাড়াই সেখানেই বেড়াল। ও যেন একাই একশ'। সর্বদা পায়ের সঙ্গে লেগেই আছে। পদে পদে এ রকম বেড়ালের উৎপাতের চেয়ে বজ্রাপাতও আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।

"মণ্টু!" পিসীমার শাসনের কণ্ঠ শুনি, "এই কি আমোদের সময়? আবার বেড়াল ডাকা হচ্ছে?"

"আমি ডাকি নি পিসীমা।"

তবে কে ডাকতে গেল? তোমার পিসেমশাই? এমন মিথ্যে-বাদী হয়েছ তুমি? ছি! লিখে দেব দাদাকে চিঠিতে, যে তোমার ছেলে যতই বড় হচ্ছে ততই—"

"সত্যি বলছি পিসীমা, আমি ডাকি নি। আমি কেন ডাকব? বেড়াল—"

আমার কথা শেষ হতে পায় না—"বল্ কে বেড়াল ডাকল ভবে? কার এত সখ? ভূতে ডাকতে গেল?" পিসীমার কণ্ঠস্বর কঠোর হয়।

"উহু। বেড়াল নিজেই।"

"অ্যাঁ?" আবার পিসীমার আর্তনাদ। তিনি যে বেশ বিচলিত হয়েছেন, অন্ধকারের মধ্যেই আমি তা টের পাই। "বেড়াল! ভবেই হয়েছে! আমাদের রক্ষা নেই! বেড়াল ভয়ানক বিদ্যুৎবাহী! বেড়ালের রোঁয়ায় রোঁয়ায় বিদ্যুৎ—বইয়েতেই লিখে দিয়েছে! কি সর্বনাশ। হে মা কালী! হে মা দুর্গা! হে বাবা অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস—"

"বাবা নয়, বাবারা।"—আমি ওঁকে সংশোধন করে দিই—"বহুবচন বলছ যে পিসীমা!"

"এই সময়ে আবার ইয়ার্কি?" পিসীমা ধমক দেন, "হে বাবা হনুমন্ত, হে বাবা বিভীষণ, ছোঁড়াকে বাঁচাও। অবোধ ছেলের অপরাধ নিয়ো না বাবা! (কড়—কড়—কড়াৎ—বম্‌বম্—বম্‌বম্! পিসীমা যান ক্ষেপে) এখনো বুঝি ধরে আছিস্ বেড়ালটাকে? ছুঁড়ে ফেলে দে—ছুঁড়ে ফ্যাল—এই দণ্ডে।"

ছুঁড়ে ফেলা শক্ত হয়, কেন না বেড়ালকে ধারণ করি নি ত'! কিন্তু পিসীমার আদেশ রাখতেই হবে—যে করেই হোক। অন্ধকারেই আন্দাজ করে বেড়ালের উদ্দেশে এক শূট্ ঝাড়ি। শূট্ গিয়ে লাগবি ত' লাগ্ লাগে এক তেপায়া টেবিলে; তাতে ছিল পিসেমশায়ের ওষুধ-পত্রের শিশি (যত রাজ্যের সৌখীন ব্যারাম সব পিসেমশায়ের একচেটে)—সেই এক ধাক্কাতেই টেবিল চিৎপাৎ এবং শিশি-বোতল সব চুরমার।

পিসীমা গোঁ গোঁ করতে থাকেন; অজ্ঞান হয়ে গেলেন কিনা এই ঘুটঘুট্টির মধ্যে তো বোঝাবার যো নেই! কিন্তু যখন জানেন ঘরের মধ্যে বজ্রপাত নয়, নিতান্তই টেবিলপাত—তখন তাঁর গোঙানি থামে আপনিই সামলে ওঠেন।

"যাক, ভগবান্ খুব বাঁচিয়েছেন এবার। ওটাকে ঝেড়ে ফেলেছিস্ তো? বেশ করেছিস্! (অন্য সময় হলে তাঁর আদরের মেনির গায়ে কাউকে হাত ঠেকাতেও দেন না, কিন্তু এখন বিদ্যুতের সামনে, বেড়ালের ওপরে ও পিসীমার চিত্ত নেই)। তুই এক কাজ কর মণ্টু, ঐ তেপায়াটার ওপর দাঁড়া। কাঠের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ-চলাচল করে না। চেয়ার কিংবা টেবিলের ওপর দাঁড়ানোই এখন সব চেয়ে নিরাপদ। দাঁড়িয়েছিস?"

"উঁহুঁ—"

(ক্যাশ্ ক্কড়-ক্কড়াৎ—ববম্ বম্—বম্ বম্!)

"কি দস্যি ছেলে বাবা! দাঁড়াস্ নি এখনও? তুই কি আমাকে পাগল করবি? হে মা দুর্গা—"

"দাঁড়িয়েছি পিসীমা!"

(বিদ্যুতের ঝলক—দুম্দাম্ দমাদ্দম্—কড়—কড়—কড়াৎ!)

"এমন দুর্যোগের রাত কাটলে হয়! দোহাই মা দুর্গা! তোর পিসেমশাই কাল এসে আমাদের জ্যান্ত দেখবে কিনা কে জানে! পরের ছেলেকে এনে কি বিপদেই পড়লুম! দাদাকে আমি কৈফিয়ত দেব কি?—"

অতি সন্তর্পণে এবং সসঙ্কোচে ক্ষীণকায় তেপায়ার ওপর সসেমিরা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। নীরবে পিসীমার কাতরোক্তি শুনি।

"...মণ্টু, ভূমিকম্পের সময় কি করে রে? শাঁখ, ঘণ্টা বাজায় না? ওতেই ভূমিকম্প থেমে যায়—নয় কি? ঝড়-বৃষ্টি কি ভূমিকম্পের চেয়ে কম মারাত্মক? আয়, আমরা শাঁখ, ঘণ্টা বাজাই—তা' হলে ঝড়-বৃষ্টিও থামবে। শাঁখ কুলুঙ্গিতেই আছে, আমি নিচ্ছি। ওধারের তাক থেকে ঘণ্টাটা তুই পেড়ে আন্। অন্ধকারে পারবি তো?"

অন্ধকারেই আমি ঘাড় নাড়ি।

"এনেছিস? বড্ড দেরী করিস্ তুই। বাঁচতে আর দিলি না আমাদের।"

ডাকের এবং শাঁখের অন্বেষণে তিনটে চেয়ার ওল্টাই, গোটাকত গেলাস ফেলি, জলের কুঁজোকে নিপাত করি।—"এনেছি পিসীমা।"

বেশ এবার ঐ তেপায়াটার ওপর দাঁড়া। খুব জোরে পেট্— আকাশে দেবতারা শুনতে পান। আমি শাখ বাজাচ্ছি।"

পিসীমা শাঁখ বাজান, আমি ঘণ্টা পিটি। প্রাণপণেই পিটি। কানের সমস্ত পোকা বেরিয়ে আসে।

হঠাৎ একটা জানালা খুলে যায়, একটা ছায়ামূর্তি ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। চোর নাকি? পিসীমা ভয়ে কাঠ হয়ে যান। আমিও ঘণ্টাবাদ্য থামাই।

"ডাকাত পড়েছে নাকি?"—ছায়ামূর্তি বলে,—"তোরা কি লাগিয়েছিস্ মণ্টে? এ সব কি কাণ্ড?"

"বিদ্যুৎ তাড়াচ্ছি পিসেমশাই!" করুণ কণ্ঠে আমি বলি।

"বিদ্যুৎ। আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই, বিনা মেঘেই বিদ্যুৎ? এমন খাসা চাঁদনী রাত—আর তোদের কাছে বজ্রপাত? বাইরে চেয়ে দেখ দেখি!"

তাইতো বাইরে তাকিয়ে দেখি পরিষ্কার ধবধবে জ্যোৎস্না। আমি ও পিসীমা দু'জনেই দেখি। পিসীমা বলেন,—"তাহলে এত দুম্‌দাম, বজ্রপাতের শব্দ, বিদ্যুতের ঝলকানি—এসব কিছুই না?"

"ও, ওই আওয়াজ?" পিসেমশায়ের উচ্চহাস্য আরম্ভ হয়— "জমিদারের ছেলের অন্নপ্রাশন কিনা। কলকাতা থেকে যত রাজ্যের বাজির অর্ডার দিয়েছেন। রাত এগারোটার ট্রেনে সেসব পৌঁছল—বোমা, পট্‌কা, তুবড়ি, উড়ন-তুবড়ি, হাউই—আরও কত কি। এতক্ষণ তো বাজি পোড়ানোই হচ্ছিল—তারই ঝলক দেখেছ, তারই আওয়াজ শুনেছ তোমরা।"

পিসেমশাইয়ের হাসি আর থামতে চায় না।

ফটো তোলার ফ্যাসাদ

আমার কোনো ফোটো নেই। কেন নেই, সে এক করুণ কাহিনী।

একবার এক ফোটোওয়ালার দোকানে ভয়ে ভয়ে পা দিয়েছিলাম। গিয়ে বল্লাম, "আমার একখানা ফোটো তোলাতে চাই।"

ফোটোগ্রাফার আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন—তাঁর চাউনির মধ্যে উৎসাহের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না।

"বসুন্ এখানে।" বল্লেন তিনি: "একটু সবুর করতে হবে।"

সবুর করছিতো করছিই, এর মধ্যে কতো লোক এল গেল; স্টুডিয়োর মধ্যে গেল এবং সেখান থেকে বেরুলো। অবশেষে, আমার মতো একখানা মুখ নিয়ে এমন ফোটোব্যস্ত লোকের সম্মুখে কোন্ মুখে এলাম, এই ভেবে মনে মনে সন্তপ্ত হচ্ছি, এমন সময়ে ফোটোগ্রাফার ভেতরের ফটক উন্মুক্ত করলেন।

আমার জন্যেই এবার। "ভেতরে আসুন।" তাঁর ধারালো গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। গেলাম ভেতরে।

"বসুন ভালো হয়ে।" বল্লেন ফোটোগ্রাফার।

বস্‌লাম।

"ওই কি বসা হোলো নাকি?" ধমক্ দিলেন ভদ্রলোক।

আমার যথাসাধ্য আমাকে বসালাম। নিজেকে যতদূর বসানো যায়, যতটা পরিপাটিরূপে সম্ভব, তার কোনো ত্রুটি হয়নি।

"ও ভাবে নয়, এই ভাবে।" এগিয়ে এসে তিনি আমার হাত পা গুলো ঠিকঠাক করে' দিলেন।

"একদম্ নড়বেন না।"

আমিও প্রাণপণে অনড় হয়ে রয়েছি। ভদ্রলোক একটা যন্ত্রকে টেনে হিঁচড়ে আমার সামনে এনে খাড়া করলেন। তার-পর তিনি কী করলেন কে জানে, অত্যুজ্জ্বল একটা আলো আচমকা আমার মুখের ওপর এসে পড়ল। রেলগাড়ির ইঞ্জিন্ থেকে যেরকম আলো বেরয় সেই ধরণের অনেকটা।

আলোর ধাকায় একটু চম্‌কে গেলেও নিজেকে সামলে নিতে পেরেছি। আমার বসার মধ্যেও কোনো বিচ্যুতি ঘটেনি!

ভদ্রলোক এবার গুঁড়ি মেরে যন্ত্রটার ভেতর গিয়ে সেঁধুলেন এবং একটা কালো কাপড় সর্বাঙ্গীন করে' টেনে দিলেন নিজের ওপর। ওর মধ্যে গিয়ে একেবারে তিনি নিশ্চল হয়ে গেলেন। মনে হোলো, প্রাণ ভরে' তিনি আমার মুণ্ডপাত করছেন। তবু আমি অটল হয়ে রইলাম।

আমার ধারণাটা ঠিক। একটু পরেই বেরিয়ে এসে তিনি ঘাড় নাড়াতে লাগলেন।

"মুখটা তত সুবিধের নয়।" ঘাড় নাড়তে নাড়তে তিনি জানালেন।

"আমি জানি।" বৈরাগ্যের সুরে আমি বললাম। আমার কাছে কিছু নতুন খবর নয়।

তবুও তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। "মুখটা অতোটা ঠাস্‌বোঝাই না হলেই ভালো হোতো। ওর তিনভাগ ভর্তি হলেই যথেষ্ট ছিল। ভালো হোতো দেখতে। "

"আমারো তাই মত।" আমি সায় দিলাম : "এবং একথা আপনার মুখের বেলাও খাটে। সত্যি বলতে, শুধু আপনি-আমি কেন, অনেকের সম্বন্ধেই ঐ এক কথা। চারধারে কতো মুখই না দেখা যায়, হাড় বের করা, ত্যাব্‌ড়ানো, তোব্‌ড়নো, সরু, বেঢপ্—নামমাত্রসার কতো রকমেই না মুখ! তাদের সব যদি তিনভাগ ভর্তি করে' দেওয়া যেত তাহলে এই

পৃথিবী কী সুরম্য স্থানই না হোতো ভেবে দেখুন। চারিদিকের দৃশ্যপটই বদলে যেত, বলতে কি!"

কিন্তু ফোটোগ্রাফারের আমার কথায় কান ছিলনা। তিনি এগিয়ে এসে দুহাতে আমার মুখখানা তুলে ধরে' এধারে ওপারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে দেখতে লাগ্লেন। ভাগ্যিস মুখটা ক্ষণভঙ্গুর নয়, নইলে যেভাবে তিনি বেঁকিয়ে চুরিয়ে দেখছিলেন, নেহাৎ কাঁচের কাজ হলে তাঁর পক্ষে এটা খুবই কাঁচা কাজ হচ্ছিল বলতে আমি বাধ্য।

আমার সম্মুখ থেকে এক তাল খসিয়ে ফেলা যায় কিনা সম্ভবতঃ সেই সুবিধাই তিনি দেখেছিলেন। আমাকে সুরূপ করার তাঁর ওরূপ প্রয়াস প্রসংশনীয় হলেও, তিলোত্তমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তালোত্তম হবার ইচ্ছা কোনদিনই আমার ছিলনা। আমি বললামঃ "উঃ! অমন করে' নাকটা টিপ্বেন না। আমার ভারী হাঁচি পাচ্ছে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁচ্চো!"

হাঁচির তাড়নায় তাঁর হাতছাড়া হতে হোলো। আলগা হয়ে মাথাটা খেলিয়ে নেবার সুযোগ পেলাম। ঘাড়টা টন্টন্ করছিল।

নিজের মুখ নিজে না রাখলে কে রাখবে?—সে কথা ঠিক, কিন্তু যাকে পরের মুখরক্ষা করে' নিজের মুখ রাখতে হয় তার দিকটাও তো দেখবার! বলা বাহুল্য, ফোটোগ্রাফার সেইদিক থেকেই সব কিছু দেখছিলেন।

"নাঃ, কোনো ধার দিয়েই মুখটাকে যুৎসই দেখানো যায় না।" ভগ্নকণ্ঠে বল্তে তিনি বাধ্য হলেনঃ "তাছাড়া, আপনার এই মাথাটাই আদপে আমার পছন্দ নয়।"

"মাথার ওপরে কি আমার কোনো হাতে আছে?" আমি বলি "তাছাড়া, হাত থাক্লেও নিজের মাথায় কেউ হস্তক্ষেপ করে না। করতে চায়না। কেননা ভালো মন্দ যাই হোক,

নিজের মাথা নিজস্ব জিনিস। নিজের ঘাড় কেউ নিজে ভাঙে ?”
...একথাটাও আমি জানতে চাই।

“মাথার দোষেই মুখটা এরকম হয়েছে মনে হচ্ছে। মাথার এমন ছিরি বলেই মুখটা বিচ্ছিরি, আসলে, আপনার মাথারই গলদ্।” তিনি বিশদ করেন—হাঁ করুন তো, দেখি।”

হাঁ করতে না করতেই হুকুম হোলো—“বুজিয়ে ফেলুন। আপনার হাঁয়ের মধ্যেও ঢের গোল।”

শুনে হাঁ হতে হয়। হাঁ মাত্রই তো গোলাকার, কে না জানে ? কিন্তু সেকথা ওকে জানাবার আমার সাহস হয়না।

“একটু দাঁড়ান্ তো।”

দাঁড়ালাম। দাঁড়াতে গিয়ে দেখলাম একটু দাঁড়ানো যায় না। কাজেই একটু নয়, সম্পূর্ণ ই দাঁড়াতে হোলো। ঠিক হোলো কিনা কে জানে।

“ডান পা তুলুন।”

তুললাম।

“এ পাটাও তুলুন্। উঁহু উঁহু—ও-পাটা নানাবেন না।”

চেষ্টা করলে কী না হয় ? মানুষের অসাধ্য কী আছে ? এক সঙ্গে দু—পা তোলার কৃতকার্য হয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়তে হোলো।

নাঃ, আপনি দেখছি দাঁড়াতেও শেখেন নি। নিজের পায়ে কি করে’ দাঁড়াতে হয় তাও জানেন না। ছ্যা।”

নিজের পায়ে কি করে’ না দাঁড়াতে হয় জানতাম না বটে। আমার অজ্ঞতা উনি ঠিকই ধরেচেন। সত্য কথার ওপর কোনো কথা চলেনা। চুপ্ করে থাকি।

“নাঃ, দাঁড় করিয়ে আপনাকে নেয়া যাবে না দেখছি। বসেই থাকুন্। না, না বসতে যাবেন না—বসতে যাবেন না—যেমন পড়ে আছেন পড়ে থাকুন তেমনি—ওই মাটির ওপরেই। দেখি ওইভাবেই কিছু করা যায় কি না।”

এই বলে’ সেই যন্ত্রটার পেছনে—সেটাকে দণ্ডায়মান ক্যামেরা

বলেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল—তার কালো পর্দার আড়ালে তিনি গা ঢাকা দিলেন।

"আপনার কানগুলোও তেমন সুবিধের না কেমন খাড়া "খাড়া। বড্ড খারাপ। কানের মাথাগুলো একটু ঢালু করে'—হ্যাঁ, আরেকটু নামিয়ে দিন্ তো। হ্যাঁ হয়েছে—"

কালো ওড়না ভেদ করে' ওর প্রত্যাদেশ আসতে থাকে: "এবার চোখ সোজা করুন্—হ্যাঁ! চোখও আপনার ভালো নয়। চোখ হবে চোখা, তা না, ভাটার মতো এ কী চোখ? যাক, যা হবার হয়েছে, আর ঘার নাড়বেন না। আপনি ঘাড় নাড়লেই আপনার চোখকে আমি চোখ বলে মেনে নেব এতটা আনাড়ি আমায় পাননি। আপনিও অতো চৌকস্ নন্। যাক, চোখের তারাগুলোকে গড়িয়ে গড়িয়ে ঠিক মাঝখানে নিয়ে আসুন এবার। কটাক্ষ করুন আমার দিকে। কি করে' কটাক্ষ করতে হয় তাও শেখেন নি—ছি ছি! না না, অমন তীব্র কটাক্ষ নয়! অতটা রোষকষায়িত হতে কি আমি আপনাকে বলিছি? বেশ স্নিগ্ধ কোমল সস্নেহ চক্ষে আমার প্রতি তাকান—কৃপ কটাক্ষ যাকে বলে আর কি, হ্যাঁ, ওই রকম! এবার হাত দুটো হাঁটুর ওপর রাখুন। হয়েচে। আর দয়া করে' মুখটা একটু ওপরপানে তুলুন্ তো—ততোখানি নয়—ঈষৎ! হ্যাঁ, এই ঠিক। এইবার বুকটা একটু ফোলান্ দিকি। না না, অতোটা না। অতো বড়ো ছাতি আমার চাইনে! মহেন্দ্রদত্তের ছাতি বানাতে বলেছি কি, যে যতো খুসি ফোলাচ্চেন? এইবার গলা টাকে একটু তুবড়ে দিন্ ।···বেশ! আর কোমরটাকে একটু কুঁচকে নিন্। বাঃ। এরপর কনুইদের একটু দুমড়ে নেয়া দরকার! ব্যাস্। কিন্তু তবুও মুখটা আমার মোটেই ভালো ঠেকৃচে না। বড্ডো বিচ্ছির—বড্ডো বেশ ভরাট—কিন্তু কী আর করা যাবে?"

এতক্ষণ মুখ বুজে নিজের মুখের ওপর ওর নিন্দাবাদ শুনেছি —কিন্তু আর সহ্য করা গেল না। আমিও মুখর হয়ে উঠলাম —'শুনুন্ মশাই, এ মুখ আমার—আপনার নয়! এমন গায়ে পড়ে আমার মুখের ওপর এত কথা শোনাবার কে আপনি শুনি? এমুখ আপনি ইজারা নেন্‌নি, আপনার কেনা নয়,—এমুখ আমার নিজের। আমি এত বছর এই মুখ নিয়ে ঘর করছি —এর বিষয়ে আমকে আর আপনার জানাতে হবে না। এর কোথায় গুণ এবং কী গলদ্—কিছুই আমার অজানা নেই। এর ড্রয়িংয়ে একটু খুত আছে—হয়তো একটু বেশিই আছে, কিন্তু তাও, বলতে হয়, ভগবান আমার একার জন্য এই মুখ সৃষ্টি করেননি। আমার ঘাড়ে বসানো বলে হয়ত আমি এর বাহন হতে পারি, কিন্তু আমিই এর একমাত্র মালিক নই। অন্যান্য যারা এর ব্যবহারকারী তাদের বরাতক্রমেই এরকমটা ঘটছে তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু তাহলেও এই একটি ছাড়া দেখবার মতো আর কোন মুখ আমার স্টকে নেই—"

"থামুন থামুন! রাখুন নিজের ইষ্টক! নিজের মুখের আর এত ব্যাখ্যানা করতে হবে না! তবু যদি দ্রষ্টব্য একখানা মুখ হোতো ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বলেন!

"না হোক, তবু আমি এর জন্যেই বিধাতার কাছে কৃতজ্ঞ। হয়তো তিনি ব্যস্ত ছিলেন, পৃথিবীর বড়ো বড়ো মুখপাত্রদের মন দিয়ে বানাচ্ছিলেন, এমন সময়ে আমার মুখ্য কথাটা নিয়ে তাঁকে বিরক্ত করতে গেছি, তাড়াতাড়ির দু-একটা আচড়ে তিনি যেটুকু পেরেছেন বানিয়ে দিয়েছেন—তবু যে তিনি আমার সঙ্গে এই মৌখিকতাটুকু করেছিলেন—একেবারে আমায় বিমুখ করেন নি, এতেই আমি খুসি। যতদূর মনে হচ্ছে আমায় কন্ধকাটা দেখতে পেলেই আপনার স্ফূর্তি হয়—হয়তো আপনি ছাড়াও আরো অনেক আমাকে সেইরূপেই দেখতে চান—কিন্তু

আপনাদের সে-সদিচ্ছা পূর্ণ করা আমার অসাধ্য। একথা আমি মুক্ত কণ্ঠেই বলতে চাই।

এত বলে' আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করি।

"আপনার নিজের মুখকে আপনি বড্ড ভালবাসেন দেখা যাচ্ছে।" তাঁর মুখে ঠাট্টার সুর।

"আশ্চর্য কী! দিনের পর দিন দেখে দেখে এবং একসঙ্গে থেকে আমরা যদি পরস্পরকে ভালোবেসে থাকি কিছু বিচিত্র না। আমাদের ব্যক্তিগত ভালোবাসায় আনার কটাক্ষ করার কী আছে? তাছাড়া, এই কানও কিছু আপনার কান নয়, আপনার কেনা না, এই কানেরই বা আপনি নিন্দা করবেন কেন? আর এই গালও হচ্ছে আমার গাল—আমার কপিরাইট—আপনি এর প্রকাশক নন, একে গাল দেবার আপনার কী এক্তিয়ার? আমার গাল একটু বেশী ভরাট বলে' যদি তার ফোটো না ওঠে সে দোষ কিছু আমার গালের নয়, দোষ আপনার মেশিনের! আপনার ক্যামেরা যদি এতোই সরু হয় যে আমার গাল তার মধ্যে না সেঁধয় তার আমি কী করব! আমার সমস্ত মুখ যদি আপনার এই সামান্য ক্যামেরার এক ফোঁটা লেন্সে না ধরা পড়ে তার জন্যে আমি দায়ী নই—। যাক্ গে যা হবার হয়েছে, আর দরকার নেই, ফোটো তুলতে আসাই আমার ঝকমারি! আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না—আমার ফোটো তোলার সখ মিটেছে।"

এই বলে' আমার হুমড়ি খাওয়া অবস্থা ছেড়ে আমি তেড়ে ফুঁড়ে উঠে পড়ি—সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁক করে' এক আওয়াজ—!

"উঠতে পারেন। আপনার ফোটো উঠে গেছে।" ভদ্রলোক জানান। শুনে আমি শক্ খাই। ক্যামেরাটাও কম শক্ খায়নি দেখা যায়। তখনো সে কাঁপছিল।...আশ্চর্য্য না, এরকম একটা মুখের মুখোমুখি হওয়া তার জীবনেও হয়তো এই প্রথম।

"উঠে গেছে? কী সর্বনাশ! কই দেখি, কেমন উঠেছে।"

"এখন দেখার কিছু নেই।…নেগেটিভ থেকে ডেভলপ্ করতে হবে—তারপর তো ছবি। দিন কয়েক বাদ আসবেন। দেখাবো তখন।"

কদিন বাদে যেতেই ফোটোগ্রাফার একটি ফটোগ্রাফ আমার হাতে দিলেন। ছবি দেখে আমাকে তো চেনাই যায় না।—"এ কি আমি ?" সবিস্ময়ে আমি জিজ্ঞেস করি।

"আপনিই।"

"কিন্তু এতো ফর্সা তো আমি নই। কখনো ছিলাম না।"

"আপনাকে ফর্সা করব সে আর এমন বেশি কি ?" সগর্বে বলেন ভদ্রলোক : ফর্সা করাই আমাদের কাজ। ক্যামেরার দ্বারা আমরা সব পারি।"

"কিন্তু এই চোখগুলো—" 'একটু ইতস্তত করে বলতে হয়—"ঠিক আমার চোখ বলে' বোধ হচ্ছে না তো।"

"না, ওগুলোকে আমি রিটাচ করে দিয়েছি। তার ফলে দেখতে আরো ভালো হয়নি কি ? কেমন পটল চেরা হয়েছে দেখুন দিকি !"

"চমৎকার !…কিন্তু আমার আলুচেরাই যেন ভালো ছিলো !" অমন নিখুঁৎ চোখ পেয়েও আমার খুঁতখুঁতুনি যায় না। কেবল মনে হয়, উনি আমাকে এভাবে চক্ষুদান না করলেই পারতেন।

'-ভুরুগুলোও যেন কেমন কেমন !" আমার আবার ভ্রূক্ষেপ।

' আপনার ভুরু তুলে ফেলে নতুন ভুরু বসিয়ে দেয়া হয়েছে, দেখছেন না ? আপনার ভুরুর স্টাইল ভালো ছিলো না—এখনকার দিনে অচল। তাই আজকালকার ফ্যাশানমতো—"

'বেশ করেছেন।" আমি ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলি। "আর ওই গাল—ওই যে নাকের দুপাশে—দেখা যায় কি যায় না—ত্যাবড়ানো, ইঁদুরে-কুরে-খাওয়া ওই গাল—ও-ও কি আমার ?

"আপনার ছাড়া কার ? ওর দুধার থেকে দু সের মাংস বেরিয়েছে—বার করতে প্রাণ বেরিয়ে গেছে আমার। কিন্তু কি করব, মুখখানা মানানসই করতে হবে তো। ফোটো-শিল্পী

বলে' আমার সহরজোড়া নাম—সে খ্যাতি আমি খোয়াতে পারি না। সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সবই করতে হয়। কিন্তু তাও বলব মশাই, আপনাকে খাপ্‌সুরৎ করতে যা আমার কষ্ট গেছে—এমন ভোগান্তি আমার কখনো হয়নি। উঃ, খোদার উপর খোদকারি করা কি সহজ?...আমি বলেই পেরেছি।"

"কানগুলো কিন্তু আপনি ঠিকই রেখেচেন দেখা যাচ্ছে। কোনো কাটছাঁট করেন নি। এতক্ষণে নিজের চিহ্ন দেখে আমি একটু উৎসাহিত হই। না কোনো অংশে ন্যূন নয়, অবিকল আমার কানের মতই। এমন কি, আমার নিজের কান বলেই ভ্রম হয়।" দেখে উৎফুল্লই হতে হয়।

"হ্যাঁ, কানগুলো তেমনি রয়ে গেছে।" ফোটোগ্রাফারকে একটু যেন চিন্তিতই দেখা যায়: "তেমনি লম্বা লম্বাই বটে। তবে যদি বলেন তো আপনাকে একটু কানে খাটো করে দিতে পারি। লম্বা কান খুব বিরল কিন্তু ওর মধ্যে আপনার ব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রকাশ পাচ্ছে বলেই আপনার কানে আমি হাত দিতে যাই নি। দিতে চাইনি, যদি কিছু আপনি মনে করেন। কিন্তু যদি আপনি চান্—যদি লম্বকর্ণ হওয়া আপনার বাঞ্ছনীয় না হয়, আপনার দুটো কানই কমিয়ে—কমিয়ে কেন? একেবারে উড়িয়েই দেয়া যায়—এমন কিছু শক্ত না।"

"হ্যাঁ, তাহলে তাই করবেন। তারপরে সেই দুকানকাটা আপনার ফোটো আপনার দোকানে সাজিয়ে রেখে দেবেন। আপনার ঐ শিল্প-নিদর্শন থেকে আপনাকে আমি বঞ্চিত করব না। করতে চাইনা। আপনার ফোটো আপনারই থাক্। আপনিই বসে বসে ওর রূপসুধা পান করুন। ওতে আমার কোনোই কাজ নেই।"

আমার কথা শেষ করে' কানতে কানতে আমি স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে আসি।